ফুটবলের মহানায়ক
গোষ্ঠ পাল



জয়ন্ত দত্ত

ফুটবলের মহানায়ক

গোষ্ঠ পাল

জয়ন্ত দত্ত

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

FOOTBALER MAHANAYAK GOSTHA PAUL

(A biographical sketch of Great Footballer Gostha Paul)

by : Shri Jayanta Dutta

Published by : Shri Dwijadas Kar
Anima Prakashani
141 Keshabchandra Sen Street
Calcutta-700 009.

On : 15 November 1986

Price : Rs. 12·00

প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা, ২৮শে কার্তিক ১৩৯৩

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : বিদ্যা অশোক

মূদ্রক : শ্রীভোলানাথ পাল, তন্নুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : বারো টাকা

পরাধীন ভারতে যাঁরা জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে কলকাতা
ময়দানের ফুটবলে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু
প্রতিদানে পান নি কিছুই—এই ক্ষুদ্র
গ্রন্থখানি উৎসর্গ হল
তাঁদেরই উদ্দেশ্যে।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

ছোটদের বিশ্বকাপ ফুটবল
ছোটদের ক্রিকেটার গ্রেস
সানি গাভাসকার
গ্লোরিয়াস ইষ্টবেঙ্গল
ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান
খেলাধুলোর হাজার জিজ্ঞাসা
খেলার আইন
ক্রিকেট ট্রিলজি
দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব
জুলেরিমে থেকে ফিফা
হাউজ দ্যাট
পেলের ডায়েরী



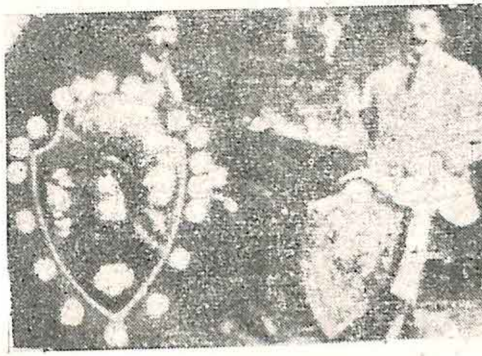
মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম ক্লাব প্রতীক।



যৌবনে গোষ্ঠ পাল



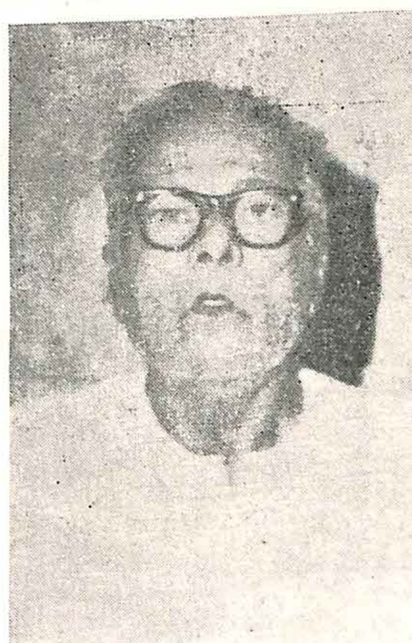
মোহনবাগান ক্লাবের বর্তমান প্রতীক।



১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক
শিবদাস ভাদুড়ী ও ক্লাব সম্পাদক শৈলেন বোস।



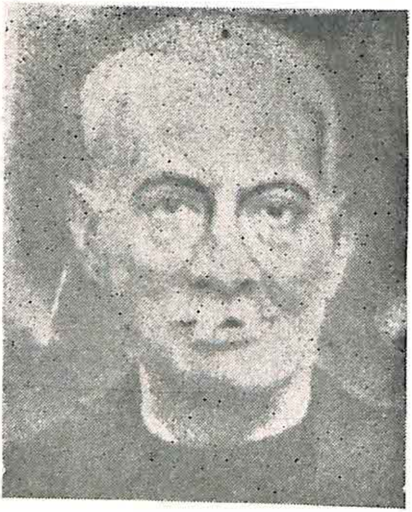
পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পাল



বর্ষীয়ান গোষ্ঠ পাল



১৯২৪ সালের ভারতীয় একাদশ।



ফুটবলের জনক
নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী



ভারতীয় ফুটবলের
স্থার তুখীরাম মজুমদার

একদা ফুটবলের উন্মাদনা যে ভাবে বাঙলা তথা বাঙালীকে জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, যে ফুটবলের অগ্নিময় বহ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল বাঙলার ময়দান, যে ফুটবলকে ভালোবেসে বাঙলার যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, যে ফুটবল ছিল পরাধীন জাতির কাছে জনজাগরণের হাতিয়ার—সেই ফুটবলের এক অগ্নিময় জীবন দেবতা হলেন—কিংবদন্তীর মহান নায়ক গোষ্ঠ পাল।

কে এই গোষ্ঠ পাল? কি তাঁর পরিচয়? তিনি কি শুধু একজন ফুটবলার মাত্র? যারা গোষ্ঠবাবুর পরিচয়কে কেবলমাত্র ফুটবলের সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে বিচার করতে চান, তাদের বলি—"ওহে, শুধু ফুটবল দিয়ে গোষ্ঠবাবুর বিচার করো না। যদি ফুটবলার হিসাবেই তাঁর পরিচয় শেষ হতো, তাহলে বাঙালীর জীবন চেতনাকে এমন ভাবে একটি মানুষ আছন্ন করে রাখতে পারতো না। আসলে মানুষটি মিশে আছেন বাঙালীর অন্তরে-অন্তরে, রক্তে-রক্তে। তাই পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাঙলার জীবন চেতনা থেকে মুছে যেতে পারে নি তাঁর ছবিটি। বরং স্মৃতির গভীরে তাঁর ফেলে আসা ছবি বারবার করে বাঙালীকে নাড়া দিয়েছে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে ফুটবল শুধু খেলা নয়, এ হলো বাঙালীর সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গোষ্ঠ পাল হলেন কিংবদন্তীর প্রবাদ পুরুষ।

ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যে কটি বস্তু আয়ত্ব করেছি তার মধ্যে ফুটবল ছিল একটি। এই ফুটবল সর্বভারতীয় স্তরে বাঙালী তথা বাঙলার মানুষ প্রথম আয়ত্ত করেছিল, তারপর বাঙলার মারফৎ ছড়িয়ে দিলো ভারতের সর্বত্র। সেই কারণে শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠি চিরটা কাল ভয় পেয়ে এসেছে বাঙালীকে। তারা বুঝেছিল যদি তাদের বিরুদ্ধে কেউ জেহাদ ঘোষণা করে, তবে করবে এই বাঙলার যুব শক্তি। তাদের অনুমান মিথ্যে হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই গোটা বাঙালী সমাজ দল বেঁধে

নেমে পড়েছিল মাঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক হাতিয়ার হিসাবে তারা বেছে নিয়েছিল ফুটবলকে।

ফুটবল হলো দলগত সংহতির খেলা। এই খেলার মধ্য দিয়েই যে একটা জাত কতো দ্রুত সংগঠিত হতে পারে তার পরিচয় দিলো বাঙলার যুব সমাজ। নগেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে পাড়ায় পাড়ায় যেদিন ক্লাব গড়ার নেশা জন্মেছিল, সেদিনই সচেতন হয়ে উঠেছিল শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠি। তারা ভাবতে পারে নি, এতো দ্রুত ফুটবল বাঙলার জনজীবনকে অনুপ্রাণিত করবে। দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ ছাত্র-সমাজ এগিয়ে আসবে ফুটবল যজ্ঞে আত্মনিবেদন করতে।

নগেন্দ্রপ্রসাদের একক প্রচেষ্টায় কলকাতার সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো একের পর এক ক্লাব। উত্তর কলকাতায় তৈরী হলো শোভাবাজার ক্লাব, কুমারটুলী ক্লাব, গড়ে উঠলো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ক্লাব ভেঙ্গে মোহনবাগান, এরিয়ান্স ও বাগবাজার ক্লাব। ক্লাব আর ক্লাব। ফুটবল নিয়ে যেন মেতে উঠলো বাঙালী। তারা বোঝাতে চাইলো, ফুটবল শুধু শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠির খেলা নয়, এই খেলার অধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আছে। এই ফুটবল হলো একমাত্র মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে একটি অসংগঠিত জাতিকে সংগঠিত করা যায়।

স্বাধীনতার স্পৃহায় তখন গোটা দেশ উন্মত্ত। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে চারদিক প্রকম্পিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বরেণ্য নেতারা একজোট হয়ে নেমে পড়েছেন পথে। রাজপথ জুড়ে চলেছে মিছিল আর মিছিল। অনুশীলন পার্টির দৌরাত্মে শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠি দিশেহারা। দেশের সর্বত্র তরুণ সমাজ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে প্রাণ উৎসর্গে বদ্ধপরিকর। প্রসন্ন চিত্তে বুক চিতিয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে একে একে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়লেন ক্ষুদিরাম বোস, কানাইলাল, সত্যেন বোস প্রমুখ বাঙলার বীর সন্তানেরা। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। বর্বরোচিত প্রতিহিংসায় রাজশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঙলার যুব শক্তির ওপর। এদের আর সংগঠিত হতে দেওয়া চলে না। যে করেই হোক অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে ব্ল্যাক নেটিভদের

বুঝিয়ে দিতে হবে—তারা ইংরেজদের তুলনায় নগণ্য, তারা অবজ্ঞার পাত্র।

দেশের যখন চরম সংকটকাল, যখন একটি অত্যাচারিত জাতি আত্মমুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে আত্মদহনের অবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ঠিক তখনই বাঙলার জীবন চেতনায় নতুন জীবনের প্রেরণা এনে দিলো মোহনবাগান ক্লাব। ফুটবলের মাধ্যমে প্রথম একটি সাহসী জয় তারা ছিনিয়ে নিলো শ্বেতাঙ্গ রাজশক্তির হাত থেকে। বৃটিশ পরাভবকে পদদলিত করে বাঙলার এগারোজন তরতাজা যুবক জয় করলো আই. এফ. এ. শীল্ড। বুঝিয়ে দিলো শক্তিশালী ইংরেজ অপরাজেয় নয়। চেষ্টা করলে তাদেরও পদানত করা যায়। মোহনবাগানের এই শীল্ড জয়ে বাংলার নবজাগরণের অধ্যায় সূচিত হলো। যে স্বাধীনতা উন্মুখ ছাত্র-সমাজ এতোদিন অত্যাচারের যন্ত্রণায় মুখ গুঁজে ছিল, তারাও মোহন-বাগানের এই জয়ের ফলে পেলো নতুন প্রেরণা। বন্দেমাতরম, ধ্বনির বিকল্প হিসাবে সেদিন দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হলো মোহনবাগানের নাম।

মোহনবাগানের এই জয়কে কেন্দ্র করে সারা দেশ হয়ে উঠলো উত্তাল। পল্লীতে পল্লীতে বাজলো নবজাগরণের কাসর-ঘন্টা। তুলসী তলায় প্রজ্জ্বলিত হলো নতুন প্রেরণার প্রদীপ। অনির্বাণ দীপশিখা বুকে নিয়ে ছাত্র-সমাজ আবার নতুন উৎসাহে স্বাধীনতার সংকল্পে হলো বদ্ধপরিকর। দেশের বরেণ্য নেতারা শীল্ড বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দিত করলেন। মোহনবাগান ক্লাব পেলো গোটা জাতির আন্তরিক সমর্থন। ন্যাশনাল কংগ্রেসের মতো মোহনবাগান ক্লাব পেলো একটি পবিত্র সংগঠনের মর্যাদা। শুরু হলো বাঙালীর জীবন চেতনায় মোহনবাগান ক্লাবকে ঘিরে নতুন আশার প্রস্তুতিপর্ব।

সেটা ছিল ১৯১১ সাল।

ফুটবল ঘিরে তখন শুরু হয়েছে জনজাগরণের কাল। মোহনবাগান জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করেছে—অতএব এই ক্লাবের পিছনে আছে সমগ্র ভারতবাসীর ঐকান্তিক সমর্থন।

সেই শুরু হলো ফুটবল ঘিরে বাঙালীর উন্মাদনা। বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে গেলো ফুটবলের নয়া ধারাটি—শত শত বাঙালী ছাত্র এসে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নিলো ফুটবল মাঠে। নতুন শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঙলার ছাত্র-সমাজ। শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সেই শুরু হলো প্রত্যক্ষ লড়াই।

ফুটবল ঘিরে বাঙালীর একাগ্রতা ও আগ্রহ অচিরেই শংকিত করে তুলেছিল শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠিকে। তারা বুঝেছিল, ফুটবলের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী থেকে বাঙালীকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তাই অচিরেই লীগ আসরে ভারতীয় দল হিসাবে তারা জায়গা করে দিতে বাধ্য হয়েছিল মোহনবাগান ও এরিয়ান্স ক্লাবকে। শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির এই নৈতিক পরাজয় সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা স্পৃহায় উজ্জিবীত করে তুলেছিল। যে বাঙালীকে এতোকাল ব্ল্যাক নেটিভ বলে শ্বেতাঙ্গ রাজকুলের কাছে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হতো, সেই বাঙালী ফুটবলের অধিকার অর্জন করে ময়দানের বুকে পাল্টা লাঞ্ছিত করলো শ্বেতাঙ্গ রাজশক্তিকে—এ যে কতো বড়ো আত্মতৃপ্তি ছিল, তা কল্পনাতে অনুভব করাও সম্ভব নয়।

ময়দানে উড়লো মোহনবাগানের পতাকা। ওই আন্দোলিত পতাকা সেদিন একটি পরাধীন জাতির মনে যে স্বাধীনতার প্রেরণা এনে দিতে পারে, মনে হয় এই বিশ্বাস শ্বেতাঙ্গ রাজগোষ্ঠির অনুমানে ছিল না। যদি থাকতো তাহলে হয়তো তারা এতো তাড়াতাড়ি ভারতীয় দলের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবকে ফুটবল আঙ্গিনায় জায়গা করে দিতো না। মোহনবাগানের ওই আন্দোলিত পবিত্র পতাকাটিকে জাতীয় পতাকার মতো সেদিন সবাই সম্মানিত করেছিল। ওই পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে সেদিন এই বাঙলার যুবশক্তি ঐক্যবদ্ধ প্রেরণায় অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছিল স্বাদেশীকতার মন্ত্রে। প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই ফুটবল মাঠেই সাহেবদের অত্যাচারের বদলা নিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে অত্যাচারের আঘাত যতোই কঠিন হোক না কেন, তাকে

অতিক্রম করার ক্ষমতা বাঙালী রাখে। বাঙলার মানুষ জানে কেমন করে বিদেশী শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

যে পতাকা উত্তোলিত করে মোহনবাগানএকটি ভারতীয় দল হিসাবে জাতীয় জীবনে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, সেই পতাকার ভার পরবর্তী পঁচিশ বছর বহন করে জাতীয় সংগ্রামকে সঞ্জীবিত করেছিল বাংলার যুবগোষ্ঠি। কবির অমোঘ বাণী সেদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল মোহনবাগান ক্লাব—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।"—সেই শক্তি মোহনবাগানের ছিল, যার উৎস ছিল বাঙালী সত্ত্বার কেন্দ্র-পুরুষ—ভারতীয় বাহিনীর অন্যতম স্বদেশী ফুটবলের নায়ক—গোষ্ঠ পাল।

আশ্চর্য! ভাবতে অবাক লাগে—একজন ফুটবলার কি ভাবে একটা পরাধীন জাতির জীবনচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল? কি ছিল তাঁর শক্তি? কি ছিল তাঁর ঐশ্বর্য? কোন গুণে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন একটি পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার বীজ মন্ত্রে? সেদিন বাঙালী বলতে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠি চিনেছিল গোষ্ঠবাবুকে। এই নাম সেদিন কৃষ্ণ নামের মতো মিশে ছিল বাঙালীর রক্তে।

গোষ্ঠবাবুকে চিনতো না কে? সবাই তাঁকে চিনতো। বস্তুতঃ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আপামর জনসাধারণের কাছে একমাত্র বাঙালী, যিনি খাঁটি স্বদেশী চরিত্র হিসাবে হৃদয়াসনে অধিষ্ঠান করেছেন—যাঁকে ঘিরে অবিভক্ত বাঙলার মানুষ ফুটবলকে কেন্দ্র করে ঝাঁপ দিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে। সেদিন সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যে একমাত্র গোষ্ঠবাবুই ছিলেন জাতীয় প্রেরণা। অথচ এই গোষ্ঠ পাল নামক ব্যক্তিটি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না। ছিলেন না জাতীয় কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী অথবা কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন ফুটবল খেলোয়াড় মাত্র—অথচ মানুষটির কঠিন ব্যক্তিত্ব সেদিন ছাপিয়ে গিয়েছিল সবাইকে। বলা বাহুল্য বিংশ দশকে বাঙলার ছাত্র-সমাজ যাঁদের নিয়ে উদ্বেলিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ঋষি অরবিন্দ, দিলীপ-কুমার রায়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি, দেশনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু। অথচ এই সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে যে মানুষটি বাঙালীর জনমানসে দেবতার মতো জাগ্রত ছিলেন তিনি হলেন মোহনবাগান নামক একটি জাতীয় ক্লাবের প্রাণশক্তি গোষ্ঠ পাল। তিনি বাঙলার যুবসমাজকে শিখিয়েছিলেন পরাধীনতার হীনমন্যতা দূর করে কেমন করে একটি পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত হতে হয়। গোষ্ঠবাবু তাই বাঙালীর কাছে শুধু ফুটবলার নন, তিনি ছিলেন বাঙালীর জীবনচেতনার আরাধ্য দেবতা—যাঁর নাম-মন্ত্র উচ্চারণ করে সেদিন বাঙালীর ছাত্র-সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ফুটবল মাঠে। ফলে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম। শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর যে কোনো কোণে সেদিন বাঙালী বাস করেছে, সেখানেই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর পবিত্র নামটি। ওই নাম যেন বাঙালীর মন্ত্র, বাঙালীর গর্ব, বাঙালীর ঐশ্বর্য।

গোষ্ঠ পাল বাঙলার ফুটবলে এসেছিলেন ১৯১৩ সালে। তখন ফুটবল ঘিরে বাঙালীর সংগ্রামী চেতনা সবেমাত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শীল্ড জয় করেছে মোহনবাগান। জাতীয় জীবনে এসেছে স্বাধীনতার প্রেরণা। দলে দলে ছাত্র-সমাজ এগিয়ে এসেছে মোহনবাগান নামক একটি ক্লাবের পাশে। মোহনবাগানের আন্দোলিত পতাকা বাঙালীর বুকের পাঁজরে জ্বালিয়েছে স্বাধীনতার আগুন। এমনি একটি স্বদেশী যুগে একজন খাঁটি স্বদেশী হিসাবেই ফুটবল মাঠে অবতীর্ণ হয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু। তাঁর আমলে মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে বড়ো ধরনের কোনো নজির গড়া সম্ভব হয় নি। ঘরে না এসেছে লীগ, না এসেছে শীল্ড —তবু সেই মরা গাঙে জাতীয়তাবাদের বান ডেকেছিল। গোষ্ঠবাবুকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি ময়দানী স্বদেশী দল। যাদের লক্ষ ছিল সাহেবদের হারানো। ফুটবল মাঠে তাদের জব্দ করা।

সেদিন শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠির সঙ্গে ভারতবাসীর একমাত্র প্রত্যক্ষ

লড়াইয়ের সুযোগ ছিল ফুটবল মাঠে। এই লড়াইতে বাঙলার যুবসমাজ তাদের প্রতি পদে পদে টক্কর দিয়েছে। পায়ের যাদুতে ভেল্কি দেখিয়েছিলেন শিবদাস ভাদুড়ী, বিজয়দাস ভাদুড়ী, গোষ্ঠ পাল, সৈয়দ সামাদের মতো বাঙালী খেলোয়াড়েরা। বাঙালী খেলোয়াড়দের কাছে ফুটবল মাঠে শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের নাকাল হতে দেখে সেদিন বাঙালীর আহত আত্মমর্যাদা যে কতখানি তৃপ্ত হতো সে কথা উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা ও মানসিক গভীরতা একালের ক্রীড়ামোদীদের নেই। কারণ দিন বদলের পটভূমিকার মধ্যে বদলে গেছে ফুটবলের সমস্ত মানসিকতা। এখন ফুটবল মাঠে খুঁজে পাওয়া যায় না এমন একটা চরিত্র, যা সমগ্র যুবশক্তির কাছে প্রেরণার আদর্শ হতে পারে। গোষ্ঠবাবু সেই আদর্শ তৈরী করেছিলেন, যে আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল গোটা একটা জাতি—এখানেই বুঝি তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ণ।

গোষ্ঠবাবুর জন্ম পূর্ব বাঙলায়। ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে পূবালী ঝড় এসেছিল, তারই পূর্বাভাস ছিল গোষ্ঠবাবুর মধ্যে। পূর্ব বাঙলার এই খেলোয়াড়টি বহু আগেই চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কীর্তিনাশা নদীর তীরে ভোজেশ্বর বলে ছোট্ট একটা গ্রাম—এই গ্রামের ছেলে গোষ্ঠবাবু। পারিবারিক অবস্থা ভালোই ছিল। পড়াশুনোর জন্য সাত-আট বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। উত্তর কলকাতা জুড়ে তখন চলেছে সাজ-সাজ রব। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ক্লাব। মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারের ছেলেদের কাছে তখন ফুটবলের শিক্ষাগুরু স্যার দুখীরাম। ফুটবলের উন্নতির জন্য মানুষটা তখন আদাজল খেয়ে লেগেছেন। তাঁর কাছে যে আসে তাকেই তিনি ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, কোনো বাছবিচার নেই। এমনি একটি ফুটবল আন্দোলনের যুগে ভোজেশ্বর থেকে কলকাতায় চলে এলো একটি কিশোর। কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই শুরু হলো তাঁর ফুটবল শিক্ষা। গাঁয়ে থাকতে ফুটবল খেলা ভালোমতো রপ্ত করা সম্ভব হয় নি। কি করে হবে? গাঁয়ের ছেলে ফুটবল কোথায় পাবে? ফুটবলের বদলে তখন গাছের

বাতাবি লেবু কখনও বা চালতা দিয়ে খেলা হতো। সে তো খেলা নয়, নিছক ছেলেখেলা। কলকাতায় এসে কিশোর গোষ্ঠপালের সঙ্গে ফুটবলের প্রথম পরিচয় ঘটলো। প্রথম পরিচয়েই প্রেম—এ প্রেম যে কতো আন্তরিক ছিল তা বোঝা গেল কয়েক বছরের মধ্যেই। ফুটবল পাগল গোষ্ঠ পাল নামক কিশোরটি অচিরেই স্থানীয় অঞ্চলে একজন বাঘা খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলো। কুমারটুলী পার্কে সেদিন ছিলেন তিনি একজন নামকরা খেলোয়াড়। তাঁর দুই পায়ে ছিল লম্বা জোরালো শট।

প্রথমে এই খেলোয়াড়টিকে আবিষ্কার করলেন মোহনবাগান ক্লাবের বিখ্যাত সেণ্টার হাফ রাজেন সেন। রাজেনবাবুর তখন বিস্তর নাম-ডাক। ১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের তিনি একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। তাঁকে চোখে দেখাও কম ভাগ্যের কথা নয়। সেই রাজেনবাবু গোষ্ঠ পালের খেলা দেখে বিস্মিত হলেন। বুঝলেন, এই ছেলেটির মধ্যে ক্ষমতা আছে, উপযুক্ত তালিম পেলে বড়ো হতে পারে। তাই কোনোরকম কালক্ষেপ না করে খেলার শেষে সোজা দেখা করলেন গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে। খেলাটি হয়েছিল ভাগ্যকুলের মাঠে। ওই দলের হয়ে খেলেছিলেন সেদিন গোষ্ঠবাবু।

কলকাতা থেকে গরমের ছুটিতে প্রতি বছর আসতেন তিনি নিজের গ্রামে। সেবারও তাই ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে। এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো মামার বাড়িতে—ওখানকার মাঠে এক খেলায় তাঁকে অংশ নিতে হবে। গোষ্ঠবাবু দ্বিধা না করেই ছুটলেন মামার বাড়ি। যোগ দিলেন ভাগ্যকুলের দলে। ভাগ্যকুলের দলে যোগ দিয়েই অস্বাভাবিক ভাবে ভাগ্য খুলে গেল গোষ্ঠবাবুর। তাঁর সেদিনের খেলা দেখে বিস্মিত রাজেন সেনগুপ্ত সাগ্রহে এগিয়ে এলেন।

সেই একজন শীল্ড বিজয়ী দলের খেলোয়াড়কে কাছ থেকে দেখা। সমস্ত শরীরে যেন তরঙ্গ বয়ে গেল। আবেগ বিহ্বল চোখে গোষ্ঠবাবু নিরীক্ষণ করলেন রাজেন সেনকে। এই কি সেই বাঙালী খেলোয়াড়দের একজন, যারা সাহেবদের হারিয়ে শীল্ড জয় করেছে! দু'চোখ ভরে দেখলেন তিনি রাজেনবাবুকে—এ দেখায় যেন তৃপ্তি নেই।

কিশোর গোষ্ঠবাবুর পিঠে হাত রেখে রাজেনবাবু বললেন—তুমি কি সত্যি সত্যি একজন ফুটবলার হতে চাও?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তাহলে তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। মোহনবাগান ক্লাবের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।

রক্তে যেন আগুন ঝরালো। একি কথা বলছেন তাঁকে রাজেনবাবু! তাঁর জন্য মোহনবাগানের দরজা খোলা আছে! কথাগুলো কানে শোনার পরও বিশ্বাস হতে চায় নি। একি স্বপ্ন নাকি সত্যি?

ভয়ে দ্বিধায় সংকোচে গুটিয়ে গিয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু। কলকাতায় ফিরে এলেন। পকেটে রাজেন সেনগুপ্তর ঠিকানা লেখা চিরকুট। ইচ্ছে ছিল দেখা করার, তবু সাহসে কুলোলো না। মনে হলো, যদি তিনি চিনতে না পারেন। যদি সেদিনের সেই ক্ষণিকের পরিচয় তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন। মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটাতেই সময় চলে গেল। রাজেনবাবুর সঙ্গে আর দেখা করা হয়ে উঠলো না।

আসলে কিশোর গোষ্ঠ পাল সেদিন মোটেই আত্মসচেতন ছিলেন না। ফলে তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কেই ছিল তাঁর নিজের সন্দেহ। আত্মনির্ভরতার যেখানে অভাব সেখানে তিনি মোহনবাগান ক্লাবের মতো একটি বিরাট ক্লাবের দরজায় গিয়ে পৌঁছুবেন কি করে? কাজেই মন থেকে সমস্ত উন্মাদনাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার তিনি নিজের খেলা নিয়ে মেতে উঠলেন। ভুলে গেলেন রাজেন সেনগুপ্তর কথাগুলি।

গোষ্ঠবাবু নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও তাঁর ভাগ্য তাঁকে দূরে সরে থাকতে দিলো না। যে জহুরী অমূল্যরত্নের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন? তাঁর পক্ষে তো চুপচাপ থাকা সম্ভব নয়। অতএব এবার রাজেনবাবুই বেরিয়ে পড়লেন সেই তরুণ খেলোয়াড়টির খোঁজে। কুমারটুলী মাঠে একরাশ ছেলেদের মধ্যে আবার তাঁকে খুঁজে বার করলেন।

—কি ব্যাপার হে, তুমি তো আর আমার সঙ্গে দেখা করলে না?

রাজেন সেনের কথায় লজ্জিত তরুণ গোষ্ঠবাবু মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না। কে যেন তাঁকে চাবুক মারলো—'এ তো ভারি অন্যায় করেছ তুমি গোষ্ঠ, তোমার মধ্যে কি শক্তি লুকিয়ে আছে তা কি তুমি জান? নিজেকে একদিন তুমি ঠিক চিনতে পারবে।' জীবন দেবতার নির্দেশ মিলেছিল সেদিন। তাই মনে কোনো রকম দ্বিধা না নিয়ে রাজেনবাবুর হাত ধরে সোজা একদিন চলে এলেন ময়দানে, মোহন-বাগান ক্লাবের তাঁবুতে।

রাজেনবাবু ক্লাবের সকলের সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—যাও মাঠে নামো, কোনো ভয় নেই।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। তবু মাঠে নামতে হলো তাঁকে। পরীক্ষার প্রাথমিক পর্বে উত্তীর্ণ হলো ছেলেটি। ঠিক ছিল, তাঁকে রাইট হাফ পজিসানে খেলানো হবে। ওই পজিসানে খেলতেই ছেলেটি অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁর ত্ব'পায়ের চমৎকার শট দেখে অনেকে বললেন, ওকে রাইট ব্যাক পজিসানে খেলানো হোক। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলেন সুকুল। তিনি বললেন, ছেলেটির যা স্বাস্থ্য এবং ত্ব'-পায়ে যা শট আছে, তাতে মনে হয় ওকে পাশে নিয়ে আমি দলের দায়িত্ব চালিয়ে নিতে পারবো।

সুকুলের কথায় আপত্তি করলো না কেউ। আপত্তি করেও কোনো লাভ নেই,কারণ তখন দলে একজন রাইট ব্যাক পজিসানের ফুটবলারের প্রয়োজন। শীল্ড বিজয়ী দলের অন্যতম সদস্য রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জী তখন অবসর নিয়েছেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণের জন্য তখন চলেছে তরুণ খেলোয়াড়ের সন্ধান—ঠিক সেই মুহূর্তে রাজেনবাবুর হাত ধরে মোহন-বাগান মাঠে গোষ্ঠবাবুর প্রবেশ।

অভিজ্ঞ সুকুলের কথায় তরুণ গোষ্ঠবাবুকে সুধীর চ্যাটার্জীর জায়গায় খেলানোর ব্যবস্থা করা হলো। কয়েকদিন বাদে খেলা পড়লো মোহন-বাগানের। খেলা ছিল ডালহৌসীর বিরুদ্ধে। তখনকার দিনে ডালহৌসী ছিল একটি বিখ্যাত দল। ম্যাচের আগে হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফলে মাঠ হলো কাদায় ভর্তি। বৃষ্টি ভেজা কাদা মাঠে

মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে প্রথম খেলতে নামলেন গোষ্ঠবাবু। তাঁর প্রথম দিনের খেলা হতাশ করলো সমর্থকদের। এ-কি খেলা নাকি! মিস্ কিকের পর মিস্ কিক্। বেশ কয়েকবার বেসামাল অবস্থা সামলে দিলেন সুকুল। তরুণ খেলোয়াড়টির খেলার বহর দেখে চোখ কপালে উঠলো সকলের। অনেকে বললেন, হাফ টাইমের সময় ছেলেটিকে বসিয়ে দিতে। সুকুল আপত্তি করলেন।

প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো। মনে মনে ছেলেটি তাঁর ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পেরেছিল। বুঝেছিল, তাঁকে দিয়ে মোহনবাগানের মতো একটা নামী ক্লাবের চলবে না। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে এলো। মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে কারো দিকে।

সেই প্রথম দিনের ম্যাচটির কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন গোষ্ঠবাবু। পরবর্তী কালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"আমার প্রথম দিনের খেলার বহর দেখে সবাই ঠিক করে ফেলেছিলেন, আর নয়—এই ছেলেটিকে দিয়ে মোহনবাগানের চলবে না। একজন কর্মকর্তা রাজেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—নাহে রাজেন, যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়, একেবারে রাবিস্—ও ছেলেকে দিয়ে মোহনবাগানের কাজ হবে না। নতুন কাউকে খুঁজে বার করতে হবে।

আমি তো লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারলাম না। খারাপ লাগছিল রাজেনবাবুর কথা ভেবে। আমার জন্য তাঁর মতো একজন মানুষকে অপমান হতে হলো। আশ্চর্য, এতো কথা সত্ত্বেও দেখলাম রাজেনবাবু কোনো বিরূপ মন্তব্য করলেন না। কেবল বললেন—একটা ম্যাচ দেখেই কি ভালো খারাপ বিচার করা যায়, ওকে আর একটা সুযোগ দিয়ে দেখলে দোষ কোথায়?

রাজেনবাবুর কথায় কেউ কোনো উত্তর দিলেন না। সেদিনের মতো মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। মনটা ভারাক্রান্ত। মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম, আর হয়তো সুযোগ মিলবে না। ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন আমার ধূলিসাৎ হয়ে গেল।"

কয়েকদিন বাদে আবার খেলা পড়লো মোহনবাগানের। এবার

বিপক্ষে বিখ্যাত মিলিটারী দল ব্ল্যাকওয়াচ। এই ব্ল্যাকওয়াচ দল তখনকার দিনের একটি সেরা গোরা দল। তারা গতবছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। এবারের লীগেও তাদের অবস্থা খুবই ভালো। এহেন ব্ল্যাকওয়াচ দলের বিরুদ্ধে যে খেলার সুযোগ হবে না এমন ধারণাই ছিল গোষ্ঠবাবুর। তবু মাঠে হাজির হলেন। ভেবেছিলেন, মাঠের বাইরে বসে দলের খেলা দেখতে হবে। কিন্তু তা হলো না। গোষ্ঠবাবুকে মনমরা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুল এগিয়ে এসে ধমক লাগালেন। বললেন—কি ব্যাপার গোষ্ঠ, জার্সি পরো নি কেন এখনও ?

—আমি জার্সি পরবো···মানে···?

—মানে আর কিছুই নয়, তুমি খেলবে। আজকের খেলায় তোমাকে ভালো খেলতেই হবে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে বেশ একটু সময় নিয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু। সুকুলবাবু নিজেই জার্সি এগিয়ে দিলেন। বললেন—সকলের আপত্তি সত্ত্বেও আজ আমি তোমাকে জোর করে মাঠে নামাচ্ছি। আশা করি তুমি আমার মুখ রক্ষা করবে।

সুকুলের কথাগুলো যেন মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। জার্সি পরে নিলেন গোষ্ঠবাবু। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আজ আমাকে ভালো খেলতেই হবে। এই ম্যাচের ওপরই নির্ভর করছে আমার খেলোয়াড় জীবনের ভবিষ্যত।'

মোহনবাগানের নিজের মাঠে খেলা ছিল সেদিন। ভাগ্যজোরে মাঠও শুকনো ছিল। জীবনপণ করে সুকুলের পাশে মাঠে নামলেন গোষ্ঠবাবু। এই ম্যাচে সত্যি তিনি সুকুলের মান রক্ষা করলেন। অভাবনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন তরুণ গোষ্ঠবাবু। তাঁকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো ব্ল্যাকওয়াচ দলের দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ডদের। তাদের সমস্ত আক্রমণ এইদিন একাই প্রতিহত করলেন গোষ্ঠবাবু। খেলা শুরু হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের। অবাক বিস্ময়ে সুকুল তাঁকে লক্ষ করলেন। বল নিয়ে কখনও তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন,

কখনও পিছিয়ে এসে বল ক্লিয়ার করছেন গোল-লাইন থেকে। তাঁর সেদিনের দৃঢ়তাপূর্ণ ভূমিকার জন্য ব্ল্যাকওয়াচ দলের পক্ষে গোল করা সম্ভব হলো না। খেলা শেষ। ব্ল্যাকওয়াচ দলের খেলোয়াড়েরা সবাই প্রশংসা করলেন নবাগত তরুণ ছেলেটির। এই একটি ম্যাচের সুবাদেই শেষ পর্যন্ত ময়দানে টিঁকে গেলেন গোষ্ঠবাবু। এই ম্যাচ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাই তিনি বলেছিলেন—"সুকুলবাবু সাহসী না হলে ওই ম্যাচে আমার পক্ষে মাঠে নামা সম্ভব হতো না। একমাত্র ওঁর জন্যই তোমরা তোমাদের গোষ্ঠবাবুকে পেয়েছো। নচেৎ কোথায় ভেসে যেতো তোমাদের গোষ্ঠ পাল।'

সেই শুরু। এরপর তিনি ফুটবল খেলেছেন একটানা কুড়ি-পঁচিশ বছর। একদিনের জন্য কেউ তাঁকে থামিয়ে দিতে পারে নি। খেলেছেন মোহনবাগান ক্লাবে। ওই ক্লাব ছিল তাঁর কাছে ধ্যান, জ্ঞান, ধর্ম ও আদর্শ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে মোহনবাগান ক্লাবের একজন বলে মনে করতেন। কেউ কিছু বললে তিনি বলতেন— "তোমরা আমাকে যে যা খুসী বলতে পারো বলো, আমি কোনো আপত্তি করবো না। কিন্তু খবরদার আমার মোহনবাগান সম্পর্কে একটিও অন্যায় কথা আমার সামনে কেউ বলতে পারবে না। আমার ক্লাবের নামে কোনো নিন্দে করা মানেই আমার মায়ের নামে নিন্দে করা—আমি কিন্তু এই নিন্দা সহ্য করবো না।" এই হলো খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের আদর্শ—আর হয়তো সেই কারণেই তিনি ফুটবলার হিসাবে মহান্।

একজন খেলোয়াড় সে তার ক্লাবকে ভালোবাসবে এটাই তো খেলোয়াড়োচিত আদর্শ হওয়া উচিত। ক্লাবকে ভালোবাসতে না পারলে সেই ক্লাবের হয়ে সে খেলবে কি করে? এখনকার খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ক্লাব প্রীতি বড়ো একটা দেখা যায় না। দেখা যাচ্ছে, যারা নামী খেলোয়াড় তারা টাকার জন্য ঘন ঘন ক্লাব বদল করছে। এই ঘন ঘন ক্লাব বদল নীতির ফলেই হয়তো একালের দিনে একজন সত্যিকার বড়ো খেলোয়াড়কে তৈরী হতে দেখা যাচ্ছে না। আসলে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, তা হলো—খাঁটি খেলোয়াড়ের সঙ্গে পবিত্র

ক্লাব-প্রীতিবোধের একটা গভীর সম্পর্ক আছে—সে সম্পর্ক তৈরী করে আন্তরিক ভালোবাসা। যদি ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা কাজ না করে, যদি ক্লাবের জার্সিকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মতো শ্রদ্ধা করতে না পারা যায়, যদি ক্লাবের পতাকাকে জাতীয় পতাকার মতো সম্মান করতে না শেখা যায়—তাহলে সেই ক্লাবের হয়ে আমরা কতটুকু ভালো খেলার আশা করতে পারি?

ফুটবলার গোষ্ঠ পালের মধ্যে এই ক্লাব-প্রীতিবোধ ছিল অসীম। তিনি ক্লাবকে শুধু ভালোবেসেছিলেন তাই নয়, এই ক্লাবের জন্য তিনি তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মোহনবাগান ক্লাব ছিল দেশমাতৃকার মতো পবিত্র। ক্লাবের জার্সিকে তাই তিনি দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। যতোদিন তাঁকে খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে খেলতে দেখা গেছে, ততোদিন তিনি খেলেছেন মোহনবাগান ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়ে। তাঁর কথাই ছিলো—"ক্লাব হলো আমার সাধনার জায়গা। এই ক্লাব আমাকে সম্মান এনে দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তাই খেলা ও ক্লাব তুটোকেই আমার সমান ভালো-বাসতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমি যে ক্লাবের হয়ে খেলছি সেই ক্লাব আমার মায়ের মতো। সন্তান হয়ে যদি মায়ের অসম্মানে রক্ত দিতে পারি, তাহলে ক্লাবের জন্যও আমায় রক্ত দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো চরিত্র গঠন করা। খেলোয়াড় হয়ে চরিত্র ঠিক রাখাই হলো সবার আগে প্রয়োজন।"

গোষ্ঠবাবুর এই কথাগুলি যে শুধু মুখের কথা ছিল না, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। একটানা পঁচিশ বছর তিনি মোহনবাগানের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে বার বার প্রমাণ করে গেছেন। ক্লাব যে তাঁর কাছে মায়ের মতো, ক্লাবের অসম্মান যে তাঁর বুকে গভীর ভাবে নাড়া দিতো, তার বহু প্রমাণও আমরা পেয়েছি। ক্লাবের নিন্দা তিনি সইতে পারতেন না। একবার একদল যুবক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান ক্লাবের নিন্দে করছিল। শোনা যায়, তারা নাকি বলাবলি করছিল—"আর মোহনবাগান ক্লাবের কথা বলো

না। সেই কবে শীল্ড পেয়েছে, তার গরবেই ক্লাবটা ডুবে গেল। বলি ঘি খাওয়া হাতের গন্ধ কি বরাবর হাতে থাকে?"

কথাটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালেন গোষ্ঠবাবু। সটান্ তিনি ছেলেদের মধ্যে প্রবেশ করে হুংকার ছেড়ে বললেন—"কে বল্লে কথাটা? বাপের বেটা হও তো আমার সামনে এসে দাঁড়াও, আমি তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।"

হঠাৎ করে গোষ্ঠবাবুকে রাগত মূর্তিতে দেখে ছেলের দল তো থমকে গেল। উত্তর না পেয়ে গোষ্ঠবাবু ছেলেদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন—"একথা বলতে তোমাদের লজ্জা করলো না? যে মায়ের বুকের দুধ খেয়েছো সেই মাকে তোমাদের অপমান করতে বাঁধলো না। তোমরা তো বাঙালী, তোমাদের মুখে এই কথা শোভা পায় না। ভুলে যেও না মোহনবাগান ক্লাব ভারতবাসীকে ফুটবলে লাথি মারার শক্তি জুগিয়েছে। তারা শিখিয়েছে সাহেবদের অত্যাচারের বদলা খেলার মাঠে কি করে নিতে হয়। কাজেই এই ক্লাবকে অসম্মান করা মানেই হচ্ছে গোটা জাতিকে অপমান করা।"

গোষ্ঠবাবুর কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারলো না। লজ্জায় মাথা হেঁট করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল ছেলের দল।

আজ্ঞে হ্যাঁ—এই হলেন খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে মোহনবাগান ক্লাবের একজন সৈনিক বলে মনে করতেন। ক্লাবের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের নিখুঁত চরিত্র বোঝাতে বর্ষীয়ান লেখক মুকুল দত্তের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি:

"১৯৫৫ সাল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত গুণীজন সম্বর্ধনায় চৌরঙ্গী রোডের অস্থায়ী মঞ্চে লোকে লোকারণ্য। চন্দন তিলকে বরণ করে ধুতি ও চাদর উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হল মহান্ খেলোয়াড়কে। নানা জনের ভাষণ ও প্রশস্তি বাণীর উত্তর দিতে উঠে দাঁড়িয়ে গোষ্ঠ পাল মাথার ওপর তুলে ধরলেন মোহনবাগান ক্লাবের পোড়া লাল পোড়া সবুজ রঙের খেলার জামা। চীৎকার করে বললেন,

'এই জামা, এই জার্সিই আমাকে যা কিছু সম্মান দিয়েছে। আমার মৃত্যুর পর যেন এই জার্সিই আমার সঙ্গে দেওয়া হয়'।"

এমন ক্লাব প্রীতি ক'জন খেলোয়াড়ের ছিল? কারো ছিল বলে কি কেউ শুনেছেন? বলতে শোনা গেছে কি কাউকে, ক্লাবের জার্সি দিয়ে আমার মৃতদেহ যেন ঢেকে দেওয়া হয়? আসলে ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধা—এই ছিল মহান্ গোষ্ঠ পালের খেলোয়াড় জীবনের প্রধান ও প্রথম সর্ত। সেই সর্তকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করেছিলেন। হয়তো সেই কারণেই তিনি সামান্য খেলোয়াড় হয়েও মহান্ আদর্শ হিসাবে আজও টিঁকে আছেন ময়দানে। তাঁর মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধায় আজও মাথা নত করতে দেখা যাচ্ছে সমগ্র ফুটবলপ্রিয় বাঙালী সমাজকে।

১৮৯৬ সালের ২০শে আগস্ট, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের ভোজেশ্বর গ্রামে মহান্ ফুটবলার গোষ্ঠ পালের জন্ম। গাঁয়ের ছেলে, সুযোগ পেলেই নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। কে কার কথা শোনে। ছেলে দিন দিন দস্যি হয়ে উঠছে। ফুটবল খেলায় ঝোঁক বড্ড বেশী। ফুটবল তো নেই, তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে গাছের বাতাবি লেবু দিয়েই চলে বল খেলা। বাড়ির গুরুজনেরা কিশোর গোষ্ঠকে লক্ষ করলেন। উঁহু, এ ছেলে গাঁয়ে থাকলে কিচ্ছু হবে না। কলকাতায় নিয়ে গেলে ছেলের পড়াশুনো হবে আর খেলাও চলবে। কলকাতায় মামার কাছে নিয়ে আসা হলো কিশোর গোষ্ঠ পালকে। বাবাই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এলেন ১৯০৪ সালে।

কিশোর গোষ্ঠ পাল কলকাতায় পা দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের এক অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে। শহর জুড়ে তখন চলেছে ইংরেজ বিদ্বেষী ঘূর্ণিঝড়। শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির বিরুদ্ধে বাঙলার যুব-সমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে তখন প্রতিবাদে সোচ্চার। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমস্ত বাঙলার আকাশ-বাতাস মুখরিত। দেশের সর্বত্র তখন চলেছে স্বদেশী হাওয়া। এমন একটি উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে কলকাতায় এসে

পৌঁছুলেন গোষ্ঠ পাল। কুমারটুলী পার্কের কাছে কৃপানাথ লেনে থাকার সুবাদে খেলার সুযোগ মিললো কুমারটুলী পার্কে। শুরু হলো ফুটবলের হাতে খড়ি। এরপর ভাগ্যকুলের হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে চমৎকার ফুটবল খেলে কিশোর বয়সেই নজর কেড়ে নিলেন রাজেন সেনগুপ্তের। তখন তাঁর বয়স আর কতো হবে—বড়ো জোর ষোলো বছর। এই বয়স কি এমন বয়স! রাজেনবাবু তাঁকে ডেকে নিলেন মোহনবাগান ক্লাবে।

সেই শুরু, হলো ময়দানের সঙ্গে গোষ্ঠবাবুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। যৌবনদীপ্ত গোষ্ঠ পাল রক্তের গভীরে স্বাদেশিকতার আগুন জ্বালিয়ে প্রবেশ করলেন ময়দানে। লক্ষ তাঁর সাহেব বধ—এই বধ বোমা দিয়ে নয়, খালি পায়ে ফুটবল দিয়ে। তাঁর সংকল্প—খেলার মাঠে খালি পায়ে ফুটবল খেলে হারাতে হবে সাহেবদের। ফুটবল মাঠে সাহেবদের হারাতে পারলেই মনে সাহস বাড়বে স্বদেশীদের। তারা লড়াই করার মতো প্রেরণা পাবে। বন্দুক আর লাঠির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর কাছে ফুটবল হবে প্রধান হাতিয়ার।

গোষ্ঠবাবুর এই মনোভাব বজায় ছিল সারাজীবন। ফুটবল মাঠে তিনি খেলোয়াড় হয়ে যতোদিন টিঁকে ছিলেন, ততোদিন তাঁকে একজন ভয়ঙ্কর স্বদেশী নেতার মতোই সমীহ করতো শ্বেতাঙ্গ সাহেবের দল।

কোনো গোরা দলের সঙ্গে খেলা থাকলে গোষ্ঠবাবু যেন স্বদেশী চেতনায় জাগ্রত হয়ে গর্জে উঠতেন। তাঁর দু চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুতো প্রতিহিংসার আগুন। বুকে জ্বলতো ঈপ্সিত স্বাধীনতার প্রজ্জ্বলিত চিতা। তাঁর কথাই ছিল, সাহেবদের ছাড়া নেই। ওরা আমাদের জাত শত্রু। ওরা আমাদের ঘর জ্বালিয়েছে, ভাইকে মেরেছে, মা-বোনের ইজ্জত লুটেছে,—খেলার মাঠে ওদের নৃশংস অত্যাচারের যথার্থ বদলা আমাকে নিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে—বাঙালী ভীত নয়। বাঙালী লড়াই করতে জানে। নাঙাবাবুরা নাঙা পায়েই পারে বুট পরিহিত সাহেবদের বাঁদর নাচ নাচাতে।

ফুটবল মাঠে গোষ্ঠবাবুকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, মাঠে খেলতে নেমে কি ভয়ানক মেজাজেই না তিনি ঘোরা ফেরা করতেন।

তাঁর পায়ের থেকে বল কেড়ে নেবে এমন সাধ্য কারো ছিল না। কোনো গোরা সৈনিক খেলোয়াড়ের পক্ষে তাঁর সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা ছিল খুব কঠিন। তিনি বল নিয়ে যখন ছুটে যেতেন, তখন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা কোনো শ্বেতাঙ্গ ফুটবলারের পক্ষে সম্ভব হতো না। এক ধাক্কা কেউ তাঁকে দিলে, তিনি তাঁকে পাল্টা দশটা ধাক্কা দিতেন। তাঁর শরীরে যেমন ছিল প্রচণ্ড শক্তি, তেমনি মনে ছিল লড়াই করার মতো কঠিন উন্মাদনা। তিনি তাঁর সঙ্গীদের প্রায়ই বলতেন—"দেখো হে, ফুটবল খেলা হলো পুরুষ মানুষের খেলা। দশটা ধাক্কা দেওয়ার ও তা সইতে পারার মতো ক্ষমতা না থাকলে ফুটবল মাঠে খেলতে নেমো না। মায়ের বুকের দুধ খেয়েছি সাহেব বাচ্চাদের বুঝিয়ে দিতে হবে না?"

গোষ্ঠবাবুর এহেন উক্তি আর তাঁর অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তার জন্য শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়েরা তাঁকে যমের মতো ভয় করতেন। শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠির কাছে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল যেমন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি ফুটবল মাঠে রাতের দুঃস্বপ্ন হিসাবে ঘুম কেড়ে ছিলেন স্বদেশী ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলা থাকলে শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠি তাই উদ্বিগ্ন হতেন। তাঁদের লক্ষ থাকতো গোষ্ঠবাবুর দিকে।

১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত গোষ্ঠবাবু এক নাগাড়ে খেলেছেন মোহনবাগান ক্লাবে। তাঁর সময় ভারতীয় দল হিসাবে মোহন-বাগান ভারতবাসীর মনে স্বাদেশীকতার প্রেরণা যোগালেও, বড় ধরনের কোনো নজির সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁর সময় ক্লাব না পেয়েছে লীগ না পেয়েছে শীল্ড। অথচ আশ্চর্য—কি দাপটেই না তিনি বিরাজ করেছিলেন ময়দানে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলার সাহস সেদিন কারো ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

গোষ্ঠবাবুর ফুটবল প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী যিনি প্রশংসা করেছেন, তিনি হলেন এরিয়ান্স ক্লাবের প্রাণ-প্রদীপ স্যার দুখীরাম মজুমদার। দুখীরামবাবু প্রায়ই তাঁর ছেলেদের ডেকে বলতেন—"গোষ্ঠকে দেখে তোরা

শেখ। বল পায়ে ওকে দেখলে মনে হয় যেন একটা মত্ত সিংহ মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি ভয়ানক গর্জন !"

কথাটা মিথ্যে নয়। গোষ্ঠবাবুর মানসিক দৃঢ়তা এবং তাঁর শারীরিক দক্ষতা তাঁকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, যার ফলে তাঁকে মাঠের মধ্যে সহজেই পৃথকভাবে চেনা যেতো।

তাঁর পায়ে বল পড়লে, কেউ যে কেড়ে নিতে এগিয়ে আসবে এমন সাহস কারো ছিল না। ফলে প্রায়ই তাঁকে দেখা যেতো হু-হু বেগে বল নিয়ে বিপক্ষ সীমানার দিকে ধেয়ে যেতে। কে তাঁকে বাধা দেবে ? কার আছে সেই সাধ্য ? তাঁর এন্টিসিপেশন ছিল দেখার মতো। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি প্রতিপক্ষের সমস্ত গতিবিধি আন্দাজ করতে পারতেন। বুঝতে পারতেন কে কখন, কি ভাবে বলটি পা থেকে ছেড়ে দেবে। ফলে বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে সহজে আটকে দেওয়া তাঁর কাছে খুব একটা কষ্টকর ছিল না। সেকালের সমস্ত নামকরা শ্বেতাঙ্গ ফরোয়ার্ডেরা তাঁর কাছে পৌঁছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হতো। তাঁর এই অভাবনীয় গুণটির জন্যই ইলিংশম্যান পত্রিকায় তাঁকে "চাইনিজ ওয়াল" সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল।

হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন, গোষ্ঠবাবু নিশ্চয় খুব মারকুটে খেলোয়াড় ছিলেন। তা না হলে তাঁকে শ্বেতাঙ্গ বুটধারী ফুটবলারেরা এতো ভয় করতেন কেন ? যাদের গোষ্ঠবাবু সম্পর্কে এই অনুমান, তাদের বলি, ফুটবল মাঠে গোষ্ঠবাবুকে অকারণে কাউকে ফাউল করতে কখনও দেখা যায় নি। অবৈধ খেলাকে তিনি মন থেকে ঘৃণা করতেন। দলের কোনো খেলোয়াড় যদি বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে অকারণে আঘাত করতো, তাহলে গোষ্ঠবাবু তাকে তিরস্কার করতে ছাড়তেন না। বরং খেলার মাঠে মেজাজের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন পাকা খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের ফুটবলার।

কলকাতা ময়দানে মারকুটে খেলোয়াড় হিসাবে অনেকের মধ্যে বিখ্যাত বাঙালী খেলোয়াড়টি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়। বলাইবাবু শুধু যে একজন ফুটবলার ছিলেন তাই নয়,

তিনি ছিলেন একজন বড় বক্‌সার। ফুটবল মাঠে শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়েরা বক্‌সার বলাইবাবুকে যথেষ্ট ভয় করতো। বহুবার বহু শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় বলাইবাবুর সঙ্গে চার্জ করতে গিয়ে জখম হয়েছে। ঠ্যাঙ ভেঙ্গে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। আবার দেখা গেছে উঁচুতে লাফিয়ে হেড করার সময় বলাইবাবু রেফারির দৃষ্টি এড়িয়ে বক্‌সিংয়ের নিখুঁত পাঞ্চে ভূতলে শায়িত করেছেন বহু শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়কে। তাঁর এই স্বভাবের জন্য ইউরোপীয়ান ফুটবলার মাত্র তাঁকে যমের মতো ভয় করতো। এর জন্য বলাইবাবুকে অবশ্য প্রায়ই ধমক খেতে হতো গোষ্ঠবাবুর কাছে। তাঁর কথা ছিল—"এতো মারধোর করে খেললে আসল খেলা খেলা যায় না। খেলোয়াড়কে মেরে জব্দ করতে হবে কেন? গায়ের জোরের ভয় দেখাবার চেয়ে কৌশলে জব্দ করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।"

আসলে ফুটবল মাঠে সেদিন গোষ্ঠবাবু এমন একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন যে, সেই গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ অবৈধ আচরণ করতে সাহস পেতো না। যে সমস্ত ইউরোপীয়ান ফুটবলার ইংলিশ বুট পায়ে দিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো, সেই তারাই আবার দেখা গেছে গোষ্ঠবাবুর মুখোমুখি হয়ে কেঁচোর মতো নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। গোষ্ঠবাবু যেমন নিজেও কাউকে অযথা ফাউল করা পছন্দ করতেন না, আবার তেমনি অকারণে কেউ তাঁকে ফাউল করলে তিনি অসম্ভব চটে যেতেন। তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পারা ছিল খুব মুশকিল ব্যাপার। বিশেষ করে, গোষ্ঠবাবুর ট্যাক্‌ল ছিল দেখার মতো। তিনি বলকে আয়ত্ব রাখার জন্য কখনোই শরীরের বাড়তি ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতেন না। তবে সেই সঙ্গে মারাত্মক ছিল তাঁর সাইড পুস্‌। কাঁধের ধাক্কায় ক্ষুদে মানুষটি বহুবার বহু জাঁদরেল গোরা খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে ছিটকে ফেলে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ছোট্টো একটা ঘটনা বলি। সেটা ছিল সম্ভবতঃ ১৯২৪-২৫ সাল। হাইল্যাণ্ডাস্‌ দলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা। তখনকার দিনে হাইল্যাণ্ডাস্‌ ছিল শক্তিশালী মিলিটারী দল। তাদের দলে ছিল বাঘা বাঘা সব খেলোয়াড় তা ছাড়া এই দলটি মারকুটে দল হিসাবে বিখ্যাত

ছিল। লীগে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা। হাইল্যাণ্ডাস্ দলের একজন খেলোয়াড়কে দেখা গেল কয়েকবার গোষ্ঠবাবুর উদ্দেশ্যে বেপরোয়া পা চালাতে। উদ্দেশ্য তার আর কিছুই নয়, গোষ্ঠবাবুকে আহত করা। ব্যাপারটা অনুমান করলেন গোষ্ঠবাবু। তিনি প্রথম কয়েকবার নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তারপর এক সময় হঠাৎ করে খেলোয়াড়টির মুখোমুখি হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—"খবরদার, বেয়াড়া ভাবে পা চালিয়েছ কি, আমি তোমার ওই পা ভেঙ্গে দেবো। সাবধানে খেলার চেষ্টা কর।"

ব্যাস—গোষ্ঠবাবুর এই হুঙ্কারেই কাজ হলো। সেই খেলোয়াড়টি আর একবারও ঘুণাক্ষরে গোষ্ঠবাবুর উদ্দেশ্যে পা চালাতে সাহস পেলো না।

মনে মনে হাসতেন তিনি। প্রায়ই হেসে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় তামাসা করে বলতেন—"ওরা আমারে এতো ভয় পায় ক্যান্ ক দেখি। আমি তো অগো কিস্যু করি নাই।"

সত্যিইতো—গোষ্ঠবাবু তো কাউকে কখনও মারধোর করেন নি! কেবল মাত্র চোখ রাঙিয়ে শাসিয়েছেন, তাতেই কাজ হয়েছে। মাঠের মধ্যে তাঁকে দেখে মনে হয়েছে যেন তিনি সকলের অভিভাবক। আসলে তাঁর কঠিন ব্যক্তিত্ব তাঁকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল যেখানে পৌঁছোলে কারো পক্ষে আর তাঁকে স্পর্শ করা সম্ভব হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো, গোষ্ঠবাবু এমন একটা কঠিন ব্যক্তিত্বের ভাবমুর্তি তৈরী করলেন কি করে? কেন তাঁকে ঘিরে এতো কথা, এতো স্তুতি, এতো শ্রদ্ধা, সম্মান? কেন তাঁকে বাঙলার মানুষ জাতীয় নেতার মর্যাদায় গ্রহণ করেছিল? কেন তাঁর ছবি বাঙালীর হৃদয়ে খোদাই হয়ে আছে? কেন বাঙালীর উষ্ণ ধমনীতে ধ্বনিতে হয় গোষ্ঠ পালের নাম? কি ছিল তাঁর মধ্যে? তিনি কি খুব একজন উচ্চাঙ্গের ফুটবলার ছিলেন? তাঁর মতো ফুটবলার কি শতবর্ষের ভারতীয় ফুটবলের আর একটিও দেখা যায় নি?

যাদের মনে এই প্রশ্ন, তাদের বলি, খেলোয়াড় হিসাবে গোষ্ঠ পাল

মোটেই অদ্বিতীয় ছিলেন না। তাঁর পায়ে কোনো যাদু ছিল না। ছিল না মোহিনী সৌন্দর্যের লাবণ্য। খেলোয়াড় হিসাবে গুণগত চাতুর্য বিচারে তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো বহু খেলোয়াড় তখন বিচরণ করতেন কলকাতা ময়দানে। গোষ্ঠবাবু যখন ময়দানে প্রবেশ করেছিলেন তখন ভারতীয় ফুটবলে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে রেখেছিলেন শতাব্দীর অন্যতম বাঙালী ফুটবলার শিবদাসবাবু (ভাদুড়ি)। ভাদুড়ি ভ্রাতৃযুগল (শিবদাস ও বিজয়দাস) সেদিনের ফুটবলে সৃষ্টি করেছিলেন এমন এক অপরিমেয় যাদু, যা বাঙালী সমাজের কাছে চিরকালের গর্বের বস্তু হয়ে আছে। সেই ভাদুড়ি যুগলকে বাংলার মানুষ আজও অস্বীকার করতে পারে নি। পারে নি গোষ্ঠবাবুর সমসাময়িক যাদুকর সামাদ সাহেবকে। লোকে বলে সামাদ সাহেবের পায়ে ফুটবল যেন কথা বলতো। মানুষটা ফুটবল নিয়ে যখন যা ইচ্ছে করতে পারতেন। তাঁর মতো বল কনট্রোল ক্ষমতা শতবর্ষের আঙ্গিনায় আর কোনো ভারতীয় ফুটবলারের মধ্যে দেখা যায় নি। সামাদ ছিলেন এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ফুটবলার। অথচ অবাক হয়ে ভাবতে হয়, শিবদাস-বিজয়দাসবাবু, সামাদ সাহেব এমন কি উমাপতি কুমার, ক্ষেত্র বসু, মনা দত্ত সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন গোষ্ঠ পাল। তিনি গরিমা ও মহত্বের মধ্যে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে ছিলেন, যেখান থেকে অতিক্রম করে যাওয়া আজও কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরাধীন যুগে গোষ্ঠবাবুর ভাবমূর্তি বাঙালী জনমনের কাছে যে কোনো স্বদেশী নেতার তুলনায় খুব একটা কম ছিল না। তাঁর প্রতি বাঙলা তথা বাঙালী জনগণের বিশ্বাসবোধ এমন গভীর ভাবে কাজ করেছিল, যার ফলে তাঁর নামটি শহরের ময়দান ছাড়িয়ে পৌঁছে দিলো ভারতের প্রায় সর্বত্র। যে কোনো স্তরের মানুষের কাছে সমান শ্রদ্ধা কুড়িয়ে গেছেন গোষ্ঠবাবু। কেরানী, উকিল, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, এমন কি হেঁসেল ঘরের বাঙালী পর্দানশীন মহিলারা পর্যন্ত তাঁর নামটির সঙ্গে ছিল পরিচিত। কাউকে নতুন করে বলে দিতে হতো না—কে এই গোষ্ঠ পাল? তিনি কি করেন? সবাই জানতো গোষ্ঠ পাল হচ্ছেন এমন একজন ভারতীয়

ফুটবলার যাঁকে শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা ভয় করে। ফুটবলের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশীয়ানা প্রতিষ্ঠা করেছেন জনগণের মধ্যে। জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁর হলো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মোট কথা তখন ভারতীয়দের অন্তরে গোষ্ঠবাবুর ভাবমূর্তি জনজাগরণের এক মস্ত ভূমিকা নিয়েছিল—যা আর কারো পক্ষে এমন স্বর্গীয় স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। এই স্বদেশ-প্রীতিবোধের জন্য গোষ্ঠ পাল সামান্য ফুটবলার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যুগকে ছাপিয়ে আজও জনমানসে জাগ্রত জীবন দেবতা হিসাবে বিরাজ করছেন।

যাঁরা একালের ফুটবলের বিশেষজ্ঞ, যাঁরা গোষ্ঠবাবুকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি, তাঁরা হয়তো গোষ্ঠবাবুর এই ভাবমূর্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দেবেন—"সেই যুগের ফুটবলে কি কোনো টেকনিক ছিল নাকি মশাই? ওঁরা ফুটবল খেলেছেন গায়ের জোরে। ও সব এলে-বেলে খেলা নিয়ে এখনকার মডার্ণ টেকনিকে ফুটবল খেলা গোষ্ঠবাবুর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাছাড়া গোষ্ঠ পালের সময়ে ভারতীয় ফুটবলের বিশেষ কোনো উন্নতি তো হয় নি। তাঁর সময় মোহনবাগান ক্লাব পারে নি বড়ো ধরনের কোনো নজির গড়তে। বরং দলকে হারতে হয়েছে। শীল্ডের ফাইনালে উঠে তাঁর অধিনায়কত্বে দল হেরেছে ক্যালকাটার কাছে। লীগ হাত ছাড়া হয়েছে বহুবার। তিনি না খেলেছেন অলিম্পিক, না খেলেছেন এখনকার ফুটবলারদের মতো এশিয়ান গেমস। তাঁর সময় ফুটবল বলতে ছিল লোকাল বা ঘরোয়া কিছু খেলা। আসলে বাঙালী বড্ড বেশী ইমোশনাল। এই ইমোশনের বাড়াবাড়ির জন্যই গোষ্ঠ পাল নামক খেলোয়াড়টিকে আমরা এতো উঁচুতে তুলে ধরেছি। আসলে সর্বহারা জাতির কাছে সহায় সম্বল বলে কিছু না থাকার জন্যই একজন সাধারণ ফুটবলারের এতখানি প্রচার সম্ভব হয়েছে। যদি গোষ্ঠবাবুর যুগকে আমরা চুলচেরা বিচার করি তাহলে ফুটবলের গরিমা বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তাঁকে না বসিয়ে অন্য কাউকে বসাতে হবে।"

গোষ্ঠ পালের মূল্যায়ণ কষতে যাঁরা প্রাপ্তির ভাণ্ডার খোঁজার চেষ্টা করেন, তাঁদের বলি—"আচ্ছা বলুন তো শেক্সপীয়ার তো নোবেল প্রাইজ

পান নি, তাহলে কেন তাঁকে ইংরেজ সমালোচকেরা ইংরিজি সাহিত্যের মহাকবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ?" এই প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর দেওয়া যেমনি সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় গোষ্ঠ পালের মহত্বের প্রকৃত মূল্যায়ণ করা। আসলে সংসারে কিছু কিছু এমন বস্তু থাকে যাদের হৃদয় উপলব্ধির দ্বারা অনুভব করতে হয়। গোষ্ঠবাবু ছিলেন সেইরকম একজন অনুভব সাপেক্ষ মানুষ—যাঁকে উপলব্ধি করতে হলে শুধু ময়দানী ফুটবল দিয়ে বিচার করলে চলবে না, তাঁকে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষ্টির সঙ্গে একাকার করে মিশিয়ে দিয়ে তবেই বিচার করতে হবে।

মনে রাখতে হবে গোষ্ঠবাবুর যুগটা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীনতার যুগ। সেই পরাধীন যুগে ভারতীয় যুবশক্তি যখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, যখন জনগণ চিত্ত শিকল ভাঙ্গার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর, যখন পরাধীন একটি জাতি আত্মবিস্মৃতির শোচনীয় দুরাবস্থায় কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় উদ্বেল, ঠিক তখনই বাংলার ময়দানে স্বাধীনতার প্রেরণা যোগাতে বাংলার জনচিত্তে ফুটবলের মাধ্যমে জীবনের নতুন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করলেন গোষ্ঠ পাল। আচরণে, বিচরণে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ফুটবল শুধু খেলা নয়, এ হলো স্বাধীনতা ঈপ্সিত জাতির কাছে মহামন্ত্রের উন্মাদনা। গোষ্ঠবাবুর ময়দানী সংগ্রামের উজ্জীবিত ভূমিকা, সেদিন গোটা বাংলার ছাত্র সমাজকে নতুন করে স্বাধীনতাসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্বের দাপটে উত্তাল হয়ে উঠেছিল জনচিত্ত। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ভারতীয় ফুটবল বাহিনীর অন্যতম সাহসী সেনাপতি হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কখন তিনি নিজের অজান্তে হয়ে উঠেছিলেন একজন জনজাগরণের নেতা—যাঁর ব্যক্তিত্ব আজও প্রতিভাত হয় বাঙালীর রক্তে! তাই দেখছি, সেদিনের যুবশক্তি প্রধান বাঙালী বলতে মনে করতেন গোষ্ঠবাবুকে।

আগেই বলেছি গোষ্ঠবাবু কোনো রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে যোগ ছিল না কোনো রাজনৈতিক দলের। তিনি না ছিলেন কংগ্রেসী—না ছিলেন অনুশীলন পার্টির সক্রিয় কর্মী। তিনি ছিলেন

স্বভাবে বাঙালী, চরিত্রে স্বদেশী এবং সর্বোপরি একজন নির্ভেজাল ফুটবলার। ফুটবলের জন্য তিনি তাঁর সর্বস্বকে ত্যাগ করেছিলেন, কেবল ত্যাগ করতে পারেন নি তাঁর শুভচেতনাসমৃদ্ধ স্বদেশী চরিত্রটিকে। যে চরিত্রটি ফুটবল মাঠে সাহেবদের সঙ্গে খেলতে খেলতে, অত্যাচারের প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতো। যাঁকে দেখে মৃতপ্রায় একটি জাতি নতুন করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে শিখেছিল —এখানেই হলো গোষ্ঠ পালের যথার্থ মূল্যায়ণ—তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। সকলকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো গরিমাদীপ্ত সীমাহীন ঐশ্বর্য।

১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা ময়দানে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন গোষ্ঠবাবু। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ একটি ভারতীয় দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক। তাঁর সময় মোহনবাগান কলকাতা ফুটবলে বড়ো ধরনের কোনো নজির গড়ে তুলতে না পারলেও, ভারতীয় সমর্থকদের তারা শিখিয়েছিল কেমন করে দুর্ধর্ষ অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ দলগুলির বিরুদ্ধে শক্তির বদলে কৌশল প্রয়োগে লড়াই করতে হয়। আসলে সেদিনের ফুটবলের আদর্শ, একালের মতো পাইয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। সেদিন খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতেন ফুটবলকে ভালোবেসে, ক্লাবের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য খেলতে—তাই সেদিনের ফুটবলের কাছে ভালো খেলাই ছিল মূল লক্ষ। খেলোয়াড়েরা চাইতেন ভালো খেলার জন্য নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে, আর সমর্থকেরাও পছন্দ করতেন বীরোচিত ভূমিকায় তাদের দল উজ্জীবিত হয়ে উঠুক। তাই ক্লাব কতোগুলি ট্রফি পেলো, কার সময় কত-গুলি ট্রফি ক্লাব ঘরে তুললো, এই সমস্ত স্থূল বস্তুচিন্তায় একালের মানুষ ফুটবলারের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য নির্ণয়ের মানদণ্ড মনে করলেও সেকালের সমর্থকেরা তা মনে করতেন না। সেই যুগে ভালো খেলা, লড়াই করা, দলকে, জাতিকে উজ্জীবিত করার মধ্যে দিয়েই খেলোয়াড়ের জাতবিচার চলতো—মূল্যায়ণ হতো একজন সত্যিকার খেলোয়াড়ের। হয়তো সেই কারণেই অসংখ্য গোষ্ঠ পাল সমকক্ষ খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে সেই যুগে একজন গোষ্ঠ পালকে বাঙালী জনচিত্ত মহানায়ক হিসাবে বেছে

নিতে পেরেছিল, যা আজকের ময়দানে ছেঁচে এমন একজন খেলোয়াড়কে খুঁজে পাওয়া যায় না, যাকে মনপ্রাণ দিয়ে বরণ করা তো দূরের কথা, ন্যূনতম গুণে সামান্য ফুটবলার বলা যায়। সেই চরিত্র, সেই আদর্শ, সেই স্বদেশ-প্রীতিবোধ, ক্লাব-প্রীতি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সাধনা এবং সর্বোপরি বীরোচিত ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মতো ফুটবলার আজ ক'জন আছেন? এখনকার ফুটবলারেরা অর্থের গোলামি করতে বসে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা বিকিয়ে বসে আছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে চরিত্রের বলিষ্ঠতা কোথায়—যা উত্তরসূরীর কাছে আদর্শ হতে পারে? কাজেই আজকের ময়দানের দিকে তাকিয়ে গোষ্ঠবাবুকে বিচার করতে বসলে ভুল করা হবে। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে বদলে গেছে ফুটবলের সার্বিক চরিত্র, ফলে বদল হয়েছে মূল্যায়ণের মাপকাঠি। যদি তা না হবে তাহলে কেমন করে সেই যুগে কোনো ট্রফি না পাওয়া মোহনবাগান ক্লাব, গোষ্ঠ পালের মতো একজন মহান খেলোয়াড়কে হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছিল, আর কেনই বা আজ অনেক ট্রফি পাওয়া ক্লাবে খুঁজে পাওয়া যায় না—একজন সত্যিকার খাঁটি আদর্শ ফুটবলারকে?

আগেই বলেছি গোষ্ঠবাবু যখন মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দিয়েছেন, তখন ভারতীয় ফুটবলে তাদের দলটি জাতীয় দলের সম্মানে ভূষিত। ভারতবাসীর জীবন চেতনায় তখন এসেছে ফুটবলের প্লাবন। ১৯১৪ সালে ট্রেডর্স কাপ জয়ের সুবাদে মোহনবাগানকে লীগ আসরে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে খেলার সুযোগ দেওয়া হলো। আই. এফ. এ-এর শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের পক্ষে মোহনবাগানকে লীগ আসরে সুযোগ না দিয়ে তখন কোনো উপায় ছিল না। লীগে ভারতীয় দলের প্রবেশ নিয়ে তখন চলেছিল জোরদার আন্দোলন। শীল্ড জয় করে মোহনবাগান তাদের দাবীকে আরো জোরদার করে তুলেছিল। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই লীগ আসরে শেষ পর্যন্ত জায়গা পেলো মোহনবাগান।

গোষ্ঠবাবুর সৌভাগ্য হয়েছিল যৌবনের শুরুতেই মোহনবাগানের

মতো একটি ঐতিহ্য সম্পন্ন ভারতীয় দলে যোগ দিয়ে লীগ আসরে বাঘা-বাঘা সাহেব দলের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করা। শুরুতে সঙ্গী পেয়েছিলেন অভিভাবক হিসাবে ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী দলের অন্যতম সদস্য সুকুলবাবুকে। কিন্তু অভিজ্ঞ সুকুলবাবুর সঙ্গে বেশী দিন খেলার সুযোগ পেলেন না গোষ্ঠবাবু। কয়েক বছরের মধ্যে ময়দান থেকে সরে গেলেন সুকুল। ফলে গোষ্ঠবাবু হয়ে গেলেন রাতারাতি জুনিয়ার থেকে সিনিয়ার ব্যাক। তিনি হলেন দলের রক্ষণ ভাগের মূল স্তম্ভ। পঁচিশ বছরের ফুটবল অধ্যায়ে গোষ্ঠবাবু পাশে পেয়েছেন অসংখ্য তরুণ খেলোয়াড়কে। এঁদের মধ্যে সুকুলবাবু অবসর নেওয়ার পর তিনি পাশে পেয়েছিলেন পান্না পরামানিক, আর দাস, ভোলা সরকার, ডাক্তার সন্মথ দত্তের মতো ফুটবলারদের। তরুণ ফুটবলারদের প্রতি গোষ্ঠবাবুর ছিল যথেষ্ট দরদ। তিনি তাদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন—"তোমরা মনের মধ্যে কোনো রকম জড়তা না রেখে নিজের খেলা খেলে যাও, আমি তোমাদের পাশে আছি।" দলের সিনিয়ার খেলোয়াড় হিসাবে গোষ্ঠবাবু সবসময় তাঁর সতীর্থদের সমস্ত ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকতেন। অনেক সময় দেখা গেছে কোনো তরুণ খেলোয়াড় তাঁর পাশে খেলতে গিয়ে যখন ভুল করছেন, তখন তিনি তাকে কোনো রকম বকাবকি না করে, তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর কথা ছিল, তরুণ ও অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের তো ভুল হবেই। আমি অভিজ্ঞ, কাজেই আমার দায়িত্ব তাদের ত্রুটিকে সামলে দেওয়া। কোনো রকম ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কোনো জুনিয়ার খেলোয়াড়কে অযথা বকাবকি করা ছিল তাঁর চরিত্র বিরুদ্ধ। তিনি বলতেন—"জুনিয়ার খেলোয়াড় তো ভুল করবেই। আমিও যখন জুনিয়ার ছিলাম, তখন অনেক ভুল করেছি। সুকুলবাবু আমাকে ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। আমি এখন অভিজ্ঞ ও সিনিয়ার খেলোয়াড়, কাজেই সুকুলবাবুর কাছ থেকে শেখা বিদ্যা তো আমাকে প্রয়োগ করতেই হবে।"

গোষ্ঠবাবুর দুই পায়ে যেমন ছিল ভারি ওজনের লম্বা শট তেমনি ছিল এন্টিসিপেশন। তাঁকে সহজ ভাবে ফাঁকি দেওয়া একরকম প্রায়

অসম্ভব ছিল। তাঁর নিখুঁত ট্যাক্‌লিং, স্ন্যাচিং এবং বল কন্‌ট্রোল ক্ষমতা ছিল অপরিমেয়। তিনি বলকে পায়ে রেখে একজন পাকা দৌড়বিদের মতো দৌড়োতে পারতেন। দৌড়ে তাঁকে ধরা ছিল খুব মুশকিল। এখনকার দিনে প্রায়ই আমরা কিছু কিছু ইংরিজি শব্দ শুনতে পাই। যেমন একজন ব্যাক বল নিয়ে আক্রমণে উঠে গেলে আমরা বলি টেকনিকের দিক দিয়ে খেলোয়াড়টি ওভার-ল্যাপ করেছে। আধুনিক ক্রীড়াবিদ্‌দের এই জাতীয় টেকনিক্যাল পরিভাষা শুনে মনে হয়, এ সমস্ত টার্ম বুঝি ফুটবলে নতুন আমদানি। আদপে কিন্তু তা নয়। গোষ্ঠবাবুর যুগেও এই ওভার-ল্যাপ পদ্ধতি চালু ছিল। তাঁকেও দেখা গেছে বহুবার নিজের সীমানা থেকে বল ধরে উইং বরাবর এগিয়ে গিয়ে সেণ্টার করতে। তাঁর সাইড পাস, ফরোয়ার্ড পাস ছিল দেখার মতো। বহুবার তিনি গোল করার মতো সুন্দর ফরোয়ার্ড পাশ যুগিয়েছেন কুমারবাবু, করুণাবাবু, ক্ষেত্র বোসের মতো ফরোয়ার্ড-দের। আবার রক্ষণভাগে তিনি যখন দলের সবাইকে এগিয়ে যেতে বলে একমাত্র গোলরক্ষককে পিছনে রেখে দলের ডিফেন্স আগলাতেন, তখন তাঁর বিচরণ ভঙ্গিমা দেখে মনে হতো যেন একটি আহত সিংহ প্রতিহিংসার স্পৃহায় শিকারের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। তাঁর ক্ষিপ্র গতি, শারীরিক ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তাঁর মানসিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা এতো নিখুঁত ছিল যে তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। তাঁর সামনে এসে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা গেছে স্যাভেজ, ওয়েস্টকট, ওয়েবার, নাইট, বেনেটের মতো খেলোয়াড়দের। তাঁর এই অভাবনীয় ক্ষমতার জন্যই তাঁকে সেকালের ইংলিশম্যান পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে "রেডরোজ" তাঁকে "চাইনিজ ওয়াল" আখ্যা দিতে বাধ্য হন। এই আখ্যার সার্থকতা গোষ্ঠবাবু আজীবন রক্ষা করেছিলেন।

১৯২১ সালে গোষ্ঠবাবু দলের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম নির্বাচিত হন। এবার একটানা ছ'বছর তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। প্রথম বছর অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েই দলকে দিলেন লীগে রাণার্স কাপের সম্মান। ক্যালকাটা হলো চ্যাম্পিয়ান। মোহনবাগানের

সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান ক্লাব ক্যালকাটার ছিল সাপ নেউলের সম্পর্ক। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এহেন দুর্ধর্ষ ক্যালকাটাকে মোহনবাগান লীগ আসরে প্রথম হারালো ১৯১৭ সালে। এরপর ক্যালকাটার কাছে জয় পেতে সময় নিলো দীর্ঘ ছুটি বছর। পরবর্তী জয় এলো ১৯২৩ সালের ফিরতি লীগে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করলেন কুমারবাবু। এই খেলাতেই মারকুটে ডুবয়ের শিনবোন দু-টুকরো করে দিলেন বলাইবাবু। ডুবয় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। মুখ টিপে হাসলেন বাঙালী সমর্থকেরা। সবাই খুশী—এ যেন বাঙালী খেলোয়াড় বলাইবাবু শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির বদলা নিলেন। রাতারাতি তিনি বাঙালী সমর্থকদের কাছে হয়ে গেলেন একজন পাকা স্বদেশী নেতা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯২১ সালে মোহনবাগান বনাম ক্যালকাটার মধ্যে শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডের খেলাটির কথা। যে দিন খেলা ছিল সে দিন আকাশে মেঘের কোনো বালাই ছিল না যে বৃষ্টি হবে। কাজেই শুকনো মাঠে খালি পায়ে বাঙালী খেলোয়াড়েরা যে ভেল্কি দেখাবে এই বিশ্বাস সকলের ছিল। ক্যালকাটা মাঠে নেমে কোনো রকম সুবিধে আদায় করতে পারলো না। রক্ষণ ভাগে গোষ্ঠবাবু দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফরোয়ার্ডে কামাল করে তুললেন কুমারবাবু, করুণাবাবু। শ্বেতাঙ্গ সমর্থকদের মুখ শুকিয়ে গেল। গেল গেল রবে সাদা গ্যালারীর সাহেবেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শ্বেতাঙ্গ রেফারি ক্লেটন বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামিয়ে দিলেন। তারপর সোজা চলে গেলেন মাঠের বাইরে। শ্বেতাঙ্গ রেফারির আচরণ দেখে মোহনবাগান সমর্থকেরা তো থ'। কি ব্যাপার? রেফারী খেলা বন্ধ করলেন কেন? গোষ্ঠবাবু এগিয়ে গেলেন। শোনা গেল মাঠের মধ্যে নাকি দর্শকেরা বসে আছেন। মাঠ ছাপিয়ে দর্শকেরা বসে থাকার জন্য খেলা বানচাল। চমৎকার! প্রতিবাদের উপায় নেই। রেফারির কথা শুনে মাঠের মধ্যে শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। গ্যালারী জ্বললো। মারধোর হলো। শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠি ক্ষেপে গেল। তারা

পুলিশ দিয়ে জনতা হটালো। এই পরিত্যাক্ত ম্যাচটি আবার অনুষ্ঠিত হলো বৃষ্টির মধ্যে। সেদিন মাঠ ঘিরে রাখা হলো পুলিশ দিয়ে। এই ভিজে মাঠে মোহনবাগান হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

বৃষ্টির মধ্যে খালি পায়ে মোহনবাগান সেই যুগে যেমন নাকাল হয়েছিল, তেমনি আবার শুকনো মাঠে বুট পরিহিত শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের নিয়ে তারাই বাঁদর নাচ নাচিয়েছিল।

১৯২৩ সালে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের শীল্ডের ফাইনাল ম্যাচটির কথা মনে পড়ে। সেবার ছিল মোহনবাগান ক্লাবের দ্বিতীয়বার ফাইনালে ওঠা। গতবারের চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা তখন একটি মারাত্মক দল। এই ম্যাচকে ঘিরে কলকাতা হয়ে উঠেছিল উত্তাল। বাঙালীর জনচিত্ত হয়ে উঠলো উদ্বেল। এইদিন মাঠের আবহাওয়া ভালো থাকলে হয়তো গোটা বাংলার মানুষ হতেন মাঠ-মুখো। কিন্তু তা আর হলো না। সকাল থেকে শুরু হলো দুর্যোগ। মেঘবৃষ্টির দুরন্তপনায় গোটা কলকাতা জলে ডুবে গেল। উত্তর কলকাতার সর্বত্র হাঁটু জল। বাঙালী সমর্থকেরা মাঠে হাজির হতে পারলেন না। সকলে আশা করেছিল এই বৃষ্টিতে হয়তো খেলা হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মাঠের অবস্থা ফুটবল অযোগ্য জেনেও শ্বেতাঙ্গ রেফারি খেলা চালালেন, ফলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারতে হলো।

সেকালের ফুটবলে জয়-পরাজয় লক্ষ ছিল না, ছিল লড়াই করার মতো মানসিকতা। ভালো খেলে দলকে হারতে দেখে একালের সমর্থকদের মতো এতো বেশী তারা হৈচৈ করতো না। আরে বাপু, খেলায় তো হার-জিৎ আছেই আছে। কেবল জিতবে তা কি হয় নাকি? কেবল দলের জয় দেখবো, পরাজয় দেখবো না, তা কি কখনও হতে পারে? মাঠের প্রতিযোগিতায় এক দলকে অন্য দলের কাছে হারতেই হবে—এর জন্য দুঃখ করে লাভ কি? তবে হ্যাঁ, দেখতে হবে লড়াইটির মধ্যে সত্যিকার লড়াই বজায় ছিল কি না। তা বলে সেকালের সমর্থকেরা যে একেবারে হৈচৈ করতো না তা নয়। দল হারলে তারাও শোক করতো, অনশন করতো, রাগারাগি করতো, চোখের জল ফেলতো।

সেবার বৃষ্টির মধ্যে ক্যালকাটা মাঠে ডালহাউসী দলের কাছে ৫-০ গোলে হারলো মোহনবাগান। সাহেবদের সেকি উচ্ছাস। লজ্জায় বাঙালী সমর্থকেরা মুখ ঢাকতে রুমাল পেলো না। একি খেললো মোহনবাগান? একি একটা খেলা হলো নাকি? নিরাশ সমর্থকেরা ক্লাবের পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ। তারা রাস্তার ত্ব'ধারে দাঁড়িয়ে তুয়ো দিচ্ছিলেন মোহনবাগান খেলোয়াড়দের। ক্যালকাটা মাঠ থেকে পায়ে হেঁটে তাঁবুতে ফিরছিল মোহনবাগান। তাদের দেখে দর্শকেরা টিটকিরি দিলেন। কেউ বা গালি-গালাজ করতে লাগলো। লজ্জায় অপমানে খেলোয়াড়দের মাথা হেঁট হয়ে গেল। হঠাৎ ওই জনতার মধ্যে থেকে একজন একটি জুতোর মালা নিয়ে এগিয়ে এলো। সামনেই পড়ে গেলেন গোষ্ঠবাবু। তিনি দলের সমর্থকটির হাতে জুতোর মালা দেখে বললেন—"আজকের এই হারের জন্য ওই মালা কি আমাদের পরাবার জন্য এনেছেন? বেশ, আপনি আমাকে ওই মালা পরিয়ে দিন। আমি দলের বর্ষীয়ান খেলোয়াড়, এই পরাজয়ের জন্য সমস্ত দোষ আমার।" কথাটা বলে গোষ্ঠবাবু যেই সমর্থকটির দিকে নীচু হয়ে মাথাটি এগিয়ে দিলেন। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল। জুতোর মালা ফেলে রেখে সরে পড়লো ছেলেটি। শ্লোগান বন্ধ হয়ে গেল।

এই হচ্ছেন গোষ্ঠবাবু যিনি দলের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে কসুর করতেন না। দলের ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁর নিজের ত্রুটি বলেই তিনি মনে করতেন। আর একবার এক ম্যাচে মোহনবাগান ক্যালকাটার কাছে হেরে গেল। এই পরাজয়ের ফলে লীগ হাতছাড়া হলো মোহনবাগানের। সমর্থকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে গালি-গালাজ করতে লাগলেন। গোষ্ঠবাবু সমর্থকদের চীৎকার শুনে এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। বললেন—"আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো আমাকে বলুন, আমি দলের ক্যাপটেন।" ব্যাস, সব চীৎকার একেবারে ঠাণ্ডা। গোষ্ঠবাবুর সামনে ঠোঁটে আর রা কাটতে পারলো না কেউ।

দলের খেলোয়াড়দের আড়াল করে নিজের ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে নিতে পারে ক'জন? ক'জন ফুটবলারের মধ্যে এই গুণ আছে?

বর্তমান ফুটবলে কি এমন একটি চরিত্র দেখা যায়? না—এখন ময়দানে আত্মত্যাগ করতে দেখা যায় না কাউকে। দেখা যায় না একজন খেলোয়াড়ের মধ্যে এমন খেলোয়াড়োচিত আচরণ, আদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। বরং আমরা এখন দেখি সমর্থকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করলে, সেই খেলোয়াড়টিকে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়াতে। তারা ভুলে যায়, যে জনতা তাদের বিদ্রূপ করছে, সেই জনতাই তাদের বড়ো করে তুলেছে। গোষ্ঠবাবুকে কিন্তু প্রায় হাসতে হাসতে বলতে শোনা যেতো—"আরে দর্শকেরা গালমন্দ তো করবেই—ওরাই তো আমাদের বড়ো করেছে, নায়ক বানিয়েছে, জাতীয় বীর তৈরী করেছে। যারা আমাদের জন্য এতো কিছু করে, একমাত্র তাদেরই অধিকার আছে আমাদের সমালোচনা করার। অনেক আশা নিয়ে, অনেক কষ্ট সহ্য করে ওরা খেলা দেখতে আসে। আশা ভঙ্গ হলে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তারা রেগে গিয়ে যদি বা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে তার জন্য আমাদের চটলে চলবে কেন? ওদের রাগকে তো প্রসন্ন চিত্তে আমাদের মেনে নিতে হবে।"

এমন করে কথা কে বলতে পারে? বলুন—কেউ পারে কি? পারবে কি একালের কোনো ফুটবলার এমনভাবে আত্মসমালোচনা করতে? আসলে স্বাধীনতার পর দেশের পটভূমি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচিত্র ভাবে বদলে গেছে। চালাকির যুগে, প্রচারের যুগে, তাই খেলোয়াড়দের কাছে ক্লাবপ্রীতি, ফুটবলপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অর্থপ্রীতি বোধ—যে বোধ আত্মসমালোচনার পরিবর্তে আত্মপ্রশংসায় আত্মপ্রবঞ্চনা করতেই শেখাচ্ছে খেলোয়াড়দের! ফলে বর্তমান বাংলার ময়দানে মহান ফুটবলার গোষ্ঠ পালের পরিবর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক মহাশূন্যতা। এই লজ্জা শুধু খেলোয়াড়দের নয়, এই লজ্জা গোটা বাংলা ও বাঙালী প্রেমীদের।

টাকা পয়সা নিয়ে খেলার রেওয়াজ এই যুগের মতো সেই পরাধীন যুগে মোটেই ছিল না। শুধু সেই যুগ কেন—কিছুদিন আগেও (ষাট

দশক) ভারতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন, তাঁরাও কেউ বড় একটা টাকাকড়ির মুখ দেখতে পান নি। বড়জোর একটা মাস মাইনের চাকরি ক্লাব তাদের জুটিয়ে দিতেন। গোষ্ঠবাবুর যুগে তাও ছিল না। খেলোয়াড়েরা মাঠে আসতেন, ক্লাবের হয়ে খেলতেন নিজের গ্যাঁটের পয়সা সম্বল করে। খেলার দিন পয়সার অভাবে তিন-চার মাইল হেঁটেও ক্লাবে আসতেন অনেকে। আসলে তখন খেলোয়াড়দের মনে ক্লাবপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি গভীরভাবে কাজ করেছিল। বাঙালী খেলোয়াড়েরা ইউরোপীয়ান দলগুলির সঙ্গে খেলা থাকলে একজন পাকা বিপ্লবীর মতো বুক চিতিয়ে লড়াই করার মতো মেজাজ বজায় রাখতেন। রক্তে তাঁদের আগুন ঝরতো। তা বলে কি তাঁদের ঘরে অভাব ছিল না? ছিল—বহু অভাবী খেলোয়াড় সেই যুগে ছিলেন, যাঁরা সামান্য অল্প টাকায় ক্লাবের জন্য শরীরের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। আসলে তাঁদের মধ্যে তখন অন্য এক ধরনের গভীর মূল্যবোধ কাজ করতো, যে বোধের জন্য তাঁরা তাঁদের চরিত্র-গুলিকে কঠিনভাবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

টাকার জন্য ক্লাব বদল এই যুগে তো হামেশাই হচ্ছে।

কিন্তু গোষ্ঠবাবুর যুগে টাকার জন্য ক্লাব বদলের নজির পাওয়া যায় খুব সামান্য। বিশেষ করে সেই যুগের যাঁরা বড় ফুটবলার ছিলেন, তাঁরা সকলেই প্রায় যে কোনো একটি দলের হয়ে খেলে গেছেন আজীবন। টাকার চাইতে ক্লাব ছিল তাঁদের কাছে অনেক বড়। যেমন গোষ্ঠবাবুর কথাই ধরা যাক, তিনি আজীবন ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের একজন। নিজেকে তিনি ওই ক্লাবের একটি স্তম্ভ বলে মনে করতেন। ফলে কোনো রকম প্রলোভন, কোনো পারিবারিক চাপ তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে টলাতে পারে নি। গোষ্ঠবাবুকে দলে পাওয়ার জন্য সেই যুগে চেষ্টা অনেকেই করেছিলেন। এমন কি তাঁর মাতুলগোষ্ঠির কাছ থেকেও গাড়ি-বাড়ির প্রস্তাব এসেছিল। তাঁকে চাকরির প্রস্তাব সরাসরি না দিলেও, মনে মনে চাকরি দেওয়ার গোপন ইচ্ছা পোষণ করতেন শ্বেতাঙ্গ হোমীরা। গোষ্ঠবাবু কোনো প্রস্তাবকেই গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর কাছে

মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোনো দলের স্থান ছিল না, মূল্যও ছিল না। যেমন ছোনেবাবুর এরিয়ান্স, তুলসীবাবুর কুমারটুলী, কুমারবাবুর মোহনবাগান—এসব যেন ছিল নাড়ির সম্পর্ক। এই ক্লাবগুলি থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার কথা যেন ভাবাই যেতো না। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, এমন একটা সময় গিয়েছে যখন প্রচণ্ড অর্থসংকটের মধ্যে পড়েছিলেন গোষ্ঠবাবু। জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও তিনি টাকার জন্য দুপুর রোদে ডালহৌসী পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে পাটের দালালী করতেন। অথচ তিনি যদি মুখ ফুটে একবার অন্ততঃ যে কোনো ইউরোপীয়ানকে চাকরির কথা বলতেন, তাহলে হাজার-বারোশ' টাকা মাইনের চাকরি পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না। সাহেবরা তাঁকে লুফে নিতো। কিন্তু আত্মসচেতন গোষ্ঠবাবু নিজের সম্মান হারাতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলতেন—"ময়দানে যাদের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বুক চিতিয়ে লড়াই করি, তাদের সামনে মাথা নীচু করে আমাকে গোলামি করতে হবে—এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তার চেয়ে অর্থাভাবে একবেলা খাব, তাও ভালো, তা বলে সাহেবদের অধীনে চাকরি নয়।"

আর একবার তো ই. বি. আর. দলে চাকরি পাকা হয়ে গিয়েছিল। বিশ-তিরিশ দশকে এই ই. বি. আর. রেল দলে বহু ভারতীয় খেলোয়াড় খেলেছেন। তখন আই. এফ. এ-এর নিয়ম এতো কড়াকড়ি ছিল না। রেল দলে চাকরি করেও অনেকে তার নিজের ক্লাবের হয়ে খেলেছে। গোষ্ঠবাবুর সঙ্গেও সেই রকম কথা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, রেলে কাজ করলেও মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে খেলার তাঁর কোনো অসুবিধে হবে না। গোষ্ঠবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন চাকরি নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে পাকা কথা বলতে গেলেন ল্যাগডেন সাহেবের সঙ্গে। সাহেবের দরজায় পৌঁছে স্লিপ পাঠাতে গিয়ে থমকে গেলেন। বিড়িতে টান দিতে দিতে ভাবলেন—"চাকরি নেব? আমার মনিব হবে কিনা ল্যাগডেন?" মনটা তাঁর বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মনে হলো—"ছিঃ, খেলাকে পণ্য করে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া, তাও আবার ল্যাগডেনের মতো একজন শ্বেতাঙ্গের কাছে?" অতএব দরজার গোড়া থেকে আবার ফিরে গেলেন

গোষ্ঠবাবু। মনে মনে নিজেকে বললেন—"থাক, খুব হয়েছে, চাকরি-টাকরির চিন্তা করে দরকার নেই—চিন্তা মাথায় থাক কেবল মোহনবাগানকে নিয়ে। মোহনবাগান থাকলেই আমি থাকবো।"

এই ছিলেন গোষ্ঠবাবু, যাঁর কাছে টাকার চাইতেও বড় ছিল তাঁর ক্লাব মোহনবাগান। গোষ্ঠবাবুর এই স্বভাবের জন্য তাঁকে সমীহ করতো সিভিলিয়ান সাহেবের দল। তারা তাঁকে 'গ্রেট পল' বলেই সকল সময় সম্বোধন করতো। এবার আসি গোষ্ঠবাবুর জনপ্রিয়তার কথায়।

ফুটবলার গোষ্ঠ পাল সেই যুগে জনপ্রিয়তার এমন একটা শীর্ষস্থানে পৌঁছে ছিলেন, যা আজকের ক্রীড়ারসিকদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। পাঠকেরা হয়তো ভাবতে পারেন, আমি কলম নিয়ে বসে আরব্য উপন্যাসের মতো চমকপ্রদ কিছু গল্প সৃষ্টি করছি গোষ্ঠবাবুর নামে।

সত্যি—গল্প বলেই মনে হয় একেকটা ঘটনা। তবে তাঁর সময়টাতো বেশী দিনের নয়। মাত্র পঞ্চাশ বছর হলো তিনি ময়দান থেকে সরে গেছেন। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যদি মানুষটি ময়দানী মানুষের কাছে সশ্রদ্ধায় টিঁকে থাকতে পারেন, যদি তাঁর ভাবমূর্তি এখনও বাঙালীর রক্তে স্পৃষ্ট হয়ে থাকে, যদি বাঙলার কৃষ্টির সঙ্গে তাঁর নামটি মহান সন্তানদের সমমর্যাদায় ভারতবাসীর জিহ্বায় আজও উচ্চারিত হয়—তাহলে বুঝতে হবে তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে যে কাহিনীগুলি শোনা যায়, তার কোনোটি মিথ্যে ছিল না। যদি গোষ্ঠ পালের জনপ্রিয়তার জনশ্রুতি মিথ্যে হয় তাহলে বলতে হবে সবুজ উদার ময়দানে, নীল আকাশের নীচে যে মূর্তিটি বাঙলার ফুটবল গরিমার শ্রেষ্ঠ স্মারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেটিও মিথ্যে! গোষ্ঠ পাল নামে কোনো ফুটবলার ছিলেন না! বাঙলার মানুষ ফুটবল খেলতে জানে না!

সত্যতা প্রমাণের যুক্তি তর্ক থাক। ফিরে আসি গোষ্ঠবাবুর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে। আগেই বলেছি, গোষ্ঠবাবু ফুটবলার হিসাবে ভারতের ময়দানে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার ছিলেন না। তাঁর সমকালে এবং

তাঁর উত্তরকালে জন্মেছেন বহু কৃতি খেলোয়াড়, যাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের গরিমা বিচারে হয়তো অনেকেই ছাপিয়ে যেতে পারেন গোষ্ঠবাবুকে।

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে মনে পড়ছে কুমারটুলি দলের বিখ্যাত ফুটবলার তুলসী দত্তের কথা। শোনা যায়, সেদিনের ফুটবলে এই তুলসীবাবু ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় অন্যতম ফুটবলার। তাঁর দুই পায়ে যেমন ছিল জোরালো শট, তেমনি ছিল শারীরিক ক্ষমতা। বলকে আয়ত্বে রাখার ব্যাপারে সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী'রা অনেকেই তুলসীবাবুকে সেরা বলেছেন। যদি গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে আমরা তুলসীবাবুকে বিচার করি, তাহলে এই দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে সেরা কে—তা নির্বাচন করা হয়ে উঠবে খুবই কঠিন।

১৯২০ সালে শীল্ডের সেমিফাইনালে এই কুমারটুলি হারিয়ে দিলো মোহনবাগানকে। মোহনবাগানের সেদিনের দলে অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন গোষ্ঠবাবু। বিপরীত দিকে কুমারটুলির সেরা খেলোয়াড় ছিলেন তুলসী দত্ত। এই ম্যাচে দুই প্রতিভাবান বাঙালী ফুলব্যাককে পরখ করার সুযোগ হয়েছিল বাঙলার ক্রীড়ামোদীদের। বলা বাহুল্য সেদিনের ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন কুমারটুলির তুলসী দত্ত। একমাত্র তাঁর জন্যই মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডদের পক্ষে সেদিনের ম্যাচে গোল দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই দুই ফুটবলার ছিলেন পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—এই দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তার উত্তর দেওয়া সেকালের কোনো সমালোচকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাহলে কি আমরা বলবো তুলসীবাবু গোষ্ঠবাবুর তুলনায় বড় ফুটবলার ছিলেন? কিংবা বলতে হবে, যে সম্মান গোষ্ঠবাবু পেয়েছেন, তার সবটুকু পাওয়ার অধিকারী ছিলেন তুলসীবাবু। শুধু তুলসী দত্ত কেন—এই শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় গোষ্ঠবাবুর আগে অনেকের নামই যুক্ত হতে পারে। হতে পারে শিবদাস ভাদুড়ি, বিজয়দাস ভাদুড়ি, উমাপতি কুমার, সৈয়দ সামাদের নাম। যোগ করা যেতে পারে তাজ, জুম্মাখান, ছোট নূর মহম্মদের নাম। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলেও, জনপ্রিয়তায় কিন্তু দেখা যায় গোষ্ঠবাবুকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন

নি। যদি পারতেন, তাহলে নিশ্চয় ময়দানের বুকে গোষ্ঠ পালের মূর্তি না গড়ে, অন্য কারো মূর্তি গড়ে তাঁকে পূজো করতো বাঙালী সমাজ।

আসলে গোষ্ঠবাবুর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্য কারো মধ্যে ছিল না, আর ছিল না বলেই তিনি ফুটবলার হয়েও ফুটবলকে ছাপিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে, যে ব্যক্তিত্ব একদা অনুপ্রাণিত করেছিল বাঙালীর স্বদেশ চেতনাকে।

গোষ্ঠবাবু ফুটবলার, তার চাইতেও বড় পরিচয় ছিল তিনি ছিলেন মনে প্রাণে একজন খাঁটি বাঙালী। কি মাঠে ময়দানে, কি ব্যবহারিক জীবনে তিনি তাঁর বাঙালী সত্তাকে জাগ্রত করে রেখেছিলেন সারাক্ষণ। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত মানুষটি সর্বক্ষণ বোঝাতে চাইতেন, তিনি একজন খাঁটি বাঙালী।

বাঙালী বলে নিজের বড় গর্ব ছিল গোষ্ঠবাবুর। তাঁর এই আত্ম-সচেতন বোধ-ই তাঁকে করে তুলেছিল একজন পাকা স্বদেশী। তিনি স্বদেশ ভাবনা বুকে নিয়েই ফুটবল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। শ্বেতাঙ্গ মাত্রই ছিল তাঁর শত্রু। শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে ফুটবল মাঠে লড়াইতে নামতেন। ফুটবল মাঠে স্বদেশী গোষ্ঠবাবু শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলালের মতোই বিপদজনক। ইংরিজি পত্র-পত্রিকায় তাই তাঁর নামের সাথে 'ডেন্‌জারাস্‌' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। বলা হতো—'গ্রেট পল'।

বাঘের মতো তেজস্বী বিক্রম নিয়ে গোষ্ঠবাবু মাঠের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করতেন। তাঁর কঠিন ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কোনো একজন শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের ছিল না। মোহনবাগান দলের হয়ে সাত বছর একটানা অধিনায়কত্ব করা গোষ্ঠবাবুর দলের ওপর ছিল প্রচণ্ড দখল। তিনি যখন দলের অধিনায়ক পদে ছিলেন না, তখনও আমরা তাঁকে দেখেছি নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে দলের ওপর নেতৃত্ব খাটাতে। দলীয় খেলোয়াড়েরাও তাঁকে প্রকৃত নেতার মতো অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু ফুটবল নয়, ক্রিকেট, হকি, টেনিস খেলাতেও পটু ছিলেন গোষ্ঠবাবু। ক্রিকেট মাঠেও তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক। হাত খুলে দেদার মেজাজে বল পেটাতে তিনি ভালোবাসতেন। ইডেন গার্ডেনে বহু ম্যাচ তিনি খেলেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। ঘটনাটা ঘটেছিল তিরিশ দশকে। গোষ্ঠবাবুর তখন বিস্তর নামডাক। ফুটবলার হিসাবে তিনি বাঙালীর জনচিত্ত তখন দখল করে ফেলেছেন। এমনি একটি সময়ে ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের একটি প্রীতি ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হলো। মোহনবাগান দলের ক্যাপ্টেন তখন গোষ্ঠবাবু। খেলা আরম্ভ হতে গোষ্ঠবাবু ধুতি মালকোঁচা মেরে মাঠে নামলেন। গোষ্ঠবাবুকে ক্রিকেট মাঠে ধুতি পরে খেলতে নামতে দেখে আপত্তি করলেন ক্যালকাটা ক্লাবের সম্ভ্রান্ত কর্মকর্তারা। তাঁরা বললেন—"এতো ভারি অন্যায় হচ্ছে। এটা ক্রিকেট খেলা। এই খেলা খেলতে হলে প্যাণ্ট পরতে হবে। মিষ্টার পলকে ধুতি পরে ক্রিকেট খেলতে দেওয়া যায় না, সদস্যদের আপত্তি।" আপত্তি জোরদার হওয়ায় ক্যালকাটা ক্লাবের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিষ্টার মারে রবার্টসন বললেন—"মিষ্টার পলকে ধুতি পরে আমরা কিছুতেই খেলতে দিতে রাজি নই। ওঁকে প্যাণ্ট পরে মাঠে নামতে হবে।"

কথাটা কানে যেতেই গর্জে উঠলেন গোষ্ঠবাবু। তিনি পরিস্কার ভাষায় বললেন—"দেখ সাহেব, আমি বাঙালী, ধুতি পাঞ্জাবী হচ্ছে আমাদের জাতীয় পোষাক। তোমাদের কথা মতো আমি আমার পোষাক তো বর্জন করতে পারবো না। আজ আমি ধুতি পরেই ক্রিকেট খেলবো।"

আপত্তি তুলে রবার্টসন বললেন—"না মিষ্টার পল, তা হয় না। ক্রিকেট আমাদের ন্যাশনাল গেম, আমরা কিছুতেই নীতি বহির্ভূত কাজ আপনাকে করতে দিতে পারি না। ধুতি পরে আপনার ক্রিকেট খেলা হবে না।"

এবার চটে উঠলেন গোষ্ঠবাবু। তাঁর স্বাদেশীকতায় ঘা পড়লো। তিনি বললেন—"অসম্ভব, প্যাণ্ট পরে আমি কিছুতেই মাঠে নামবো

না। এতে আমায় খেলতে দাও তো খেলা হবে, নচেৎ খেলা বন্ধ।" এই বলে তিনি প্যাভেলিয়ানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর দলের খেলোয়াড়দের হাঁক মেরে বললেন—"কাম অ্যাওয়ে বয়েজ।"

ব্যাস—এই ছোট্ট কথাতেই কাজ হলো। গোটা দল বেরিয়ে এলো মাঠের বাইরে। তারপর গোষ্ঠবাবুকে দেখা গেলো কোনো কথা না বলে সাহেবদের এই অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে নিঃশব্দে প্রতিবাদ জানাতে দল নিয়ে চলে গেলেন মাঠের বাইরে।

খেলা আর হলো না। এই ঘটনার পর মোহনবাগান দীর্ঘদিন আর ক্যালকাটার সঙ্গে ক্রিকেট খেলে নি। খেলে নি ক্রিকেটের সেরা নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্সে।

শুধু এই একটি ঘটনা নয়, এর চাইতেও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু ফুটবল মাঠে। সেটা ছিল ১৯৩৫ সাল। গোষ্ঠবাবু তখন দলের বর্ষীয়ান ফুটবলার। তরুণ খেলোয়াড়ের অভাবে তখনও তাঁকে মাঠে নামতে হচ্ছে। সে বছর মোহনবাগান ক্লাবের লীগে অবস্থা মোটেই ভালো নয়। খেলা পড়লো চিরশত্রু ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে। দলগত অবস্থা বিচারে ক্যালকাটার অবস্থা তখন আরও সঙ্গীন। শ্বেতাঙ্গ গরিমা বাঁচাতে রেফারি ক্লেটন বাঁশি ধরলেন ক্যালকাটার পক্ষে। পক্ষপাতিত্বের এক চরম নিদর্শন তিনি রাখলেন এইদিন। কারণে-অকারণে বাঁশি বাজিয়ে তিনি মোহনবাগান দলের প্রতিটি মুভকে বানচাল করে দিতে লাগলেন। ক্লেটনের শ্বেতাঙ্গ প্রীতিবোধ দেখে চটে গেলেন গোষ্ঠবাবু। তিনি পরিস্কার বুঝতে পারলেন, এই ম্যাচে মোহনবাগান যাতে জিততে না পারে তার জন্যই তিনি আজ বাঁশি ধরেছেন। তবু প্রথমটায় কিছু বললেন না। শেষে দেখলেন ক্লেটন সাহেব বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছেন। ম্যাচে জেতা এই অবস্থায় কিছুতেই সম্ভব নয়। এরপর ক্লেটন সাহেব অকারণে আর একবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বাঁশি বাজাতেই গর্জে উঠলেন গোষ্ঠবাবু। তাঁর স্বদেশী মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তিনি চীৎকার করে বললেন—"ওরে, আর খেইল্যা কোনো লাভ নাই। অরা আজ আমাগো খেলতে দিবো না।"

কথাটা বলেই তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ মাঠের মধ্যে বসে পড়লেন। আর তাঁর দেখাদেখি একে একে মাঠের মধ্যে বসে পড়লেন কুমারবাবু, অশোক চ্যাটার্জী, করুণাবাবুর মতো খেলোয়াড়েরা।

গোষ্ঠবাবু অধিনায়ক নন, কেবল দলের একজন সিনিয়ার খেলোয়াড় মাত্র। অথচ দেখা গেলো গোটা দলটা তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে মাঠের মধ্যে শুয়ে বসে পড়লো।

ব্যাপার দেখে চোখ কপালে উঠলো ক্যালকাটা ক্লাবের সমর্থকদের। ক্লেটন ছুটে গেলেন। খেলা থামালেন। তারপর অনুরোধ করলেন গোটা দলকে খেলার জন্য। কেউ কোনো কথা বলেন না। সকলে তাকিয়ে গোষ্ঠবাবুর দিকে। তিনি কি বললেন—দল কি খেলবে? নাকি মাঠের মধ্যে বসে থেকে খেলা ভণ্ডুল করে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে নিঃশব্দে প্রতিবাদ জানাবে?

গোষ্ঠবাবু উঠলেন না। তিনি মাঠের মাঝখানে শুয়ে থাকলেন। ফলে তাঁর দেখাদেখি গোটা দল মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকলো। সে এক অভিনব দৃশ্য!

গোটা সময় অপেক্ষা করে ক্লেটন সাহেব শেষ পর্যন্ত খেলা শেষের বাঁশি বাজাতে বাধ্য হলেন।

সেদিন ময়দানে গোষ্ঠবাবুর এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জোরদার চ্যালেঞ্জে দস্তুর মতো ঘাবড়ে গেলেন শ্বেতাঙ্গ কর্তারা। তারা গোষ্ঠবাবুর আচরণকে বাড়াবাড়ি বলে বর্ণনা করলেন। শুধু তাই নয়, গোষ্ঠবাবুর বিরুদ্ধে আই. এফ. এ. যাতে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার জন্য সাব কমিটির অনেকেই মত প্রকাশ করলেন। তাদের অভিযোগ, গোষ্ঠবাবু আই. এফ. এ.-কে অপদস্ত করতে চেয়েছেন। তিনি দলের অধিনায়ক না হওয়া সত্ত্বেও দলের খেলোয়াড়দের, রেফারি ও ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। একমাত্র তাঁর মতো সিনিয়ার প্লেয়ারের কারণেই মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়েরা মাঠের মধ্যে শুয়ে বসে অসহযোগ করেছে। এটা একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষের উচিত এই অন্যায় কাজের

জন্য গোষ্ঠবাবুকে দু-বছরের জন্য সাসপেণ্ড করা।

সাব কমিটির সদস্যরা কিন্তু সবাই একমত হতে পারলেন না। কেউ কেউ আই. এফ. এ. সভাপতিকে সর্তক করে দিয়ে বললেন—"মিষ্টার পাল কাজটি অন্যায় করেছেন বটে, তবে তার জন্য তড়িঘড়ি কোনো শাস্তি-মুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা মানেই হচ্ছে গোটা বাঙলার মানুষকে শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া। হাজার হোক তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।" ফলে শুরু হলো সাব কমিটির সদস্যদের আলোচনা। টানা পোড়েন কম হলো না। শেষ পর্যন্ত সভাপতি মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর মধ্যস্থতায় গোষ্ঠবাবুর সাস্‌পেন্‌শন বন্ধ হলো বটে, তবে সভায় গোষ্ঠবাবুর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলো।

গোষ্ঠবাবুর সেদিনের এই ঘটনায় মোহনবাগান ক্লাবের কয়েকজন কর্তাও বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। ক্লাবের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনে আহত হলেন গোষ্ঠবাবু। আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। ব্যাস—সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন—"আর নয়, অনেক হয়েছে। হে ময়দান, এবার তুমি আমায় বিদায় দাও।"

খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল ময়দান থেকে সরে গেলেও, বাঙলার ফুটবল ময়দান কিন্তু তাঁকে আজও অস্বীকার করতে পারে নি। ঘুরে ফিরে আজ পঞ্চাশ বছর বাদেও তাঁর নামটি বাঙালীর ধমনিতে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। দেখা যায় তাঁর মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে বাঙালী ফুটবল সমাজকে শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তর্পণ করতে। এই তর্পণ কি শুধু গোষ্ঠ পাল বড় খেলোয়াড় ছিলেন বলে? নাকি—অন্য কিছু?

আসলে জনপ্রিয় গোষ্ঠ পালের জনপ্রিয়তা যে আজও অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁর ভাবমূর্তির গভীরতা যে বাঙালীর সমগ্র জীবন চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার প্রমাণ মিলেছে তাঁর জন্ম তারিখটিকে "ফুটবল দিবস" হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্য (আরবি) একটি প্রবন্ধে বলে-ছিলেন—"আমি মনে করি, শুধু একজন দিকপাল ফুটবলার হিসাবে চিহ্নিত করলে গোষ্ঠ পালের প্রকৃত মূল্যায়ণ হয় না, বরং তাঁকে ছোট করা

হয়। দিকপাল ফুটবলার কলকাতার মাঠে অনেকেই হয়েছেন, কিন্তু গোষ্ঠ পাল হয়েছেন মাত্র একজন। উনিশ শতকের ধারা বেয়ে বিশ শতকের দুই-তিন দশক পর্যন্ত যেসব স্মরণীয় ও বরণীয় বাঙালী জাতির সমগ্র চেতনাকে জুড়ে ছিলেন, জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আত্মোপলব্ধির প্রয়াসে, গোষ্ঠ পাল সেই মুষ্টিমেয় মহান পুরুষদের হলেন অন্যতম। সর্বাঙ্গীন বিচারে বাঙলাদেশ তথা ভারতের এক মহান সন্তান গোষ্ঠ পাল।"

আরবির এই আত্ম-অনুভূতিমূলক বিশ্লেষণ যে কতোটা সত্য, তা আমরা এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে পাচ্ছি। ভারতীয় ফুটবলের চরমতম শূন্যতার মধ্যে, জাতীয় চরিত্র স্খলনের মধ্যে হয়তো সেই কারণেই সমকাল উত্তীর্ণ গোষ্ঠ পাল একজন সামান্য ফুটবলার হয়েও বাঙালীর একান্ত মূল্যবান শেষ সম্পদ হিসেবে একটি জাতির সমগ্র চেতনাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে স্বর্গীয় গোষ্ঠ পাল হয়ে উঠেছেন সকলের কাছে প্রেরণার ভাবমূর্তি—একি বাঙালী হিসাবে আমাদের কাছে কম গৌরবের কথা।

গোষ্ঠবাবুকে তাঁর সমকালের প্রতিটি খেলোয়াড় অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন। বাঙালীর প্রতিটি খেলোয়াড়ের কাছে পরাধীন যুগে তিনি ছিলেন আরাধ্য দেবতা। তাঁর মাঠে উপস্থিতি দলের কাছে, জাতির কাছে ছিল মস্ত ভরসা। তাই বারবার বহুজনকে ময়দানী লড়াইতে বলতে শোনা গেছে—"আমাদের ভরসা গোষ্ঠবাবু। তিনি যখন মাঠে আছেন, তখন আর চিন্তা কিসের।" সত্যি তাই—গোষ্ঠবাবু মাঠে থাকলে চিন্তা থাকতো না কারো। আর গোষ্ঠবাবুও মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সতীর্থদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন—"তোরা সবাই এগিয়ে যা, আমি একাই ওদের সামলে দিতে পারবো।" কি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস—এই আত্মবিশ্বাস ক'জনের ছিল সেই যুগে? তাঁর চেয়ে বড় খেলোয়াড় অনেকে খেলেছেন সেই সময়। অথচ তাঁর মতো করে একটি পরাধীন

জাতিকে স্বদেশ ভাবনায় অনুপ্রাণিত করতে কাউকে দেখা যায় নি। যারা শাসক শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির খেলোয়াড়, সমর্থক, তারাও গোষ্ঠবাবুকে মনে প্রাণে সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, সমীহ করতেন। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো তখনকার দিনের বিখ্যাত ইংরিজি দৈনিক পত্রিকাগুলি। মোহনবাগান ক্লাবের খেলা থাকলেই কাগজের অনেকটা জায়গা দখল করে নিতেন গোষ্ঠবাবু। এমনি একটি বিখ্যাত ইংরিজি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে গোষ্ঠবাবুকে সর্বপ্রথম শ্বেতাঙ্গ সম্পাদক "চাইনিজ ওয়াল" সম্মানে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সৈয়দ সামাদ, কুমারবাবু, ক্ষেত্র বোস, পল্টু দাসগুপ্ত, নিরোজ গাঙ্গুলী, রবি গাঙ্গুলী, আশু দত্তের মতো সেকালের যাঁরা নামী খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁরা সকলেই গোষ্ঠবাবুকে খেলার মাঠে সকল সময়ের জন্য নেতার মর্যাদা দিতেন। যে তুলসী দত্তকে সেকালের বিশেষজ্ঞের দল গোষ্ঠবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই তুলসীবাবুও গোষ্ঠ পাল সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাবনত। তুলসীবাবু মারা যাওয়ার কিছু দিন আগে আমি সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারে তুলসীবাবু বলেছিলেন—"দেখহে, বয়স হয়ে গেছে, সব কথা ঠিক আগের মতো গুছিয়ে বলতে পারি না, আর মনেও নেই। তবে গোষ্ঠবাবুর খেলা এখনও চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাই। নমস্য ব্যক্তিত্ব। এমন একটা মানুষকে তোমরা দেখতে পেলে না।"

আমি বলেছিলাম—"লোকে তো বলে শুনেছি আপনি নাকি তাঁর সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন?"

উত্তর দিতে গিয়ে তুলসীবাবু একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন—"কি করে বোঝাই বলোতো, কথাগুলো কতো মিথ্যে। আরে আমি তো নিজেই গোষ্ঠবাবুর মতো মনে মনে খেলতে চাইতাম। তাঁর মতো হওয়ার ক্ষমতা আমার মোটেই ছিল না। স্যার আশুতোষ যদি বাংলার বাঘ হয়ে থাকেন, তাহলে গোষ্ঠবাবু ছিলেন বাঙলার সিংহ। সিংহের পরাক্রমের সঙ্গে কি মুসিকের তুলনা চলে?"

শ্রদ্ধেয় তুলসীবাবুর এই উক্তি মনে হয় গোষ্ঠ পালকে মূল্যায়ণের পক্ষে যথেষ্ট।

এবার আবার আসি গোষ্ঠবাবুর জনপ্রিয়তার কথায়। ফুটবলার গোষ্ঠ পাল তাঁর যুগে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন ? উত্তরে বলা যায় জনপ্রিয়তায় সমকালে গোষ্ঠ পাল সমকক্ষ বাঙালীর সংখ্যা ছিল খুব অল্প। তিরিশ দশকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু আগেই গোষ্ঠবাবু বাঙালীর সচেতন মনকে স্পর্শ করেছিলেন, পেয়েছিলেন হৃদয়ের নাগাল। কথাটা কি একটু বাড়িয়ে বলা হলো ? এ যুগের যাঁরা ক্রীড়া রসিক, যাঁরা উৎসাহী পাঠক তাঁরা ভাবতে পারেন, আমি হয়তো গোষ্ঠ পালের বিষয়ে লিখতে বসে একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। বিশেষ করে যে ফুটবলার ওলিম্পিক, এশিয়ান গেমস অথবা মারদেকার মতো কোনো বড় আসরে কোনোদিন খেলার সুযোগ পান নি, এতো রঙিন ছবি একালের খেলোয়াড়দের মতো ছাপা হয় নি—তাঁর কি এমন জনপ্রিয়তা হতে পারে ?

পাঠকদের এই জাতীয় ভাবনা মিথ্যে নয়। সত্যিতো, গোষ্ঠবাবুর সময় আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতবাসীর কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। ছিল না এই যুগের মতো এতো বেশী ক্রীড়া বিষয়ক পত্র-পত্রিকার চটক জৌলুস—তা সত্ত্বেও গোষ্ঠবাবু জনপ্রিয়তায় এমন একটা স্তরে পৌঁছে ছিলেন, সেখানে একালের কোনো ফুটবলারের পক্ষে প্রচুর বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও পৌঁছোনো সম্ভব হয় নি আর হবেও না। কি করে হবে ? এখনকার ফুটবলে সম্বল শুধু কায়দাবাজীর। টেকনিক ও ট্যাক্‌টিসের বড় বড় গালভরা শব্দের প্রাধান্য আছে—আছে কি গোষ্ঠ-বাবুর মতো চরিত্র, হৃদয়, দৃঢ়তা, আদর্শ ও জাতিকে উদ্ব দ্ধ করার মতো প্রাণবন্ত শক্তি ? যার বিনিময়ে তাঁরা পারেন আগামী প্রজন্মের কাছে নিজেদের একটি আত্মবিশ্বাসী ভাবমুর্তি তৈরী করতে ? বর্তমানের ময়দানে এমন একজন ফুটবলারকে চোখে পড়ে না, যিনি একালের তরুণ সমাজের কাছে আদর্শ হতে পারেন, হতে পারেন প্রেরণা। ফুটবল শুধু চিত্ত বিনোদনের খেলা নয়, এই খেলা জাতীয় সংস্কৃতির একটি অংশ। এই

খেলা গড়ে তোলে চরিত্র, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি দেশাত্মবোধ—গোষ্ঠ-বাবু ছিলেন ফুটবলের সার্বিক গুণাগুণের উর্ধে এমন একটি মানুষ, যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

পাঠকদের কাছে ছোট্ট একটা ঘটনার উল্লেখ করি—শুনে হয়তো গল্প বলে মনে হতে পারে।

সালটা ছিল ১৯৪৭।

দেশ তখন সবে মাত্র ভাগ হয়েছে। অখণ্ড বাংলার মানুষ এই ভাগাভাগিতে দিশেহারা। এমনভাবে দেশটা ভাগ হয়ে যাবে এই প্রত্যাশা কারো ছিল না। বাংলাকে কি ভাগ করার কথা ছিল? না, ছিল না, ছিল না পাঞ্জাবকে ভাগ করার কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই প্রদেশের মানুষের রাজনৈতিক অবদান অপরিমেয় অথচ দুর্ভাগ্য—রক্ত ঢালা বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষকেই তাদের ভূখণ্ড ভাগ করে দিতে হলো। দেশ ভাগের ফলে শুরু হলো দাঙ্গা। শত শত পূর্ব বাংলার মানুষ সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত টপকে চলে আসতে লাগলো এই বাংলায়—কলকাতায়। পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুর ভীড়ে শিয়ালদহ ষ্টেশন ভরে গেলো। ভরে গেলো পথ ঘাট। মানুষ প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পার হয়ে আসতে লাগলো। পথে অত্যাচারের শেষ নেই। সীমান্ত রক্ষীর দল, হামলাবাজের দল, নিরাশ্রয় মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। তাদের বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই কারো। তবু মানুষ আসে, আসতে থাকে বন্যার বেগে প্রাণের দায়ে দলবদ্ধ ভাবে। এমনি একটি দল আসছিল ফরিদপুর থেকে। ফেরিঘাট পার হয়ে ট্রেনে ওঠার আগে এই দলটিকে ঘিরে ফেললো সীমান্ত রক্ষীরা। শুরু হলো তাদের বর্বরোচিত খানা তল্লাসী। যার যা পারলো তারা কেড়ে-কুড়ে নিলো। এই দলে ছিলেন এক বৃদ্ধা। তার হাতে ছোট্ট একটা পুটলি আর ছিল একটি টিনের রঙচটা বাক্স। রক্ষীবাহিনীর দল এবার এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধার সামনে। বৃদ্ধাতো ভয়ে সিট্‌কে আছেন। তারা বৃদ্ধার কাছে পৌঁছে

হুংকার ছেড়ে বললে—"এই বুড়ি, তোর পুটলিতে কি আছে দেখি।"

বৃদ্ধা বললেন—"কিছুই নেই বাবা, আমার ছেলের একটা ছবি আছে আর কয়েকটা আমসত্ব নিয়ে যাচ্ছি। ছেলে আমার আমসত্ব খেতে বড় ভালোবাসে।" বৃদ্ধার কথা তবু বিশ্বাস হলো না তাদের। তারা বৃদ্ধার পুঁটলি আর হাতের বাক্স ধরে টানাটানি করতে লাগলো। বৃদ্ধা বললেন—"ওভাবে টানাটানি করো না বাবা, আমার ছেলের ছবিটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তোর ছেলের ছবি? দেখি কি রকম তোর ছেলেকে দেখতে?"

এই বলে তারা বৃদ্ধার হাত থেকে পুটলি কেড়ে নিয়ে তল্লাসী শুরু করলো। পুঁটলি খুলতেই সীমান্ত রক্ষীরা অবাক। এ কার ছবি? এতো দেখা যাচ্ছে মোহনবাগানের জার্সি গায়ে দেওয়া গোষ্ঠ পালকে।

উৎসাহী একজন সীমান্ত রক্ষী ছবিটা হাতে নিয়ে বললে—"আপনি এই ছবি পেলেন কোথায়?"

বৃদ্ধা বললেন—"কোথায় আর পাবো বাবা, ওতো আমার ছেলে গোষ্ঠোর ছবি। তোমরা ওকে চেনো নাকি?"

সবিস্ময়ে সীমান্ত রক্ষীর দল বললে—"আপনি আমাদের গ্রেট ফুটবলার গোষ্ঠ পালের মা? তাহলে আপনি তো আমাদেরও মা।" এই বলে তারা বৃদ্ধার পায়ে হাতে দিয়ে প্রণাম করলো। শুধু প্রণাম করলো না, তারা আবার বৃদ্ধার লণ্ড-ভণ্ড হওয়া পুঁটলিটি ঠিকঠাক করে বেঁধে দিয়ে বৃদ্ধাকে ট্রেনের কামরায় যত্ন করে বসিয়ে দিয়ে গেল। বলে গেল ট্রেনের চালককে—"এই গাড়িতে গোষ্ঠবাবুর মা যাচ্ছেন, তাঁর যেন রাস্তায় কোনো রকম অসুবিধে না হয়।"

চলে যাওয়ার আগে তারা বৃদ্ধার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললে—"আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন মা, আমরা বুঝতে পারি নি, আপনি আমাদের গ্রেট গোষ্ঠ পালের মা।"

বৃদ্ধা তাদের দু-হাত ভরে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলেন। এমন বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনার উদাহরণ গোষ্ঠবাবুর জনপ্রিয়তা বোঝাতে জড়ো করা যায়, যা দিয়ে পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করা চলে। আসলে মানুষ যখন

তাঁর গুণগত আকর্ষণীয় ক্ষমতা দিয়ে অসংখ্য মানুষের হৃদয়কে জয় করে, তখন তাঁর সঙ্গে সাধারণের দূরত্ব বেড়ে যায় অনেকখানি। ঘটনাগুলি অসাধারণ বলে ঠিক তখনই অন্যের কাছে মনে হয়—মনে হয় সত্য ঘটনাগুলিকেও অবাস্তব গল্প কথা।

এবার আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। সালটা ঠিকমতো মনে নেই। তবে সময়টা ছিল সম্ভবত তিরিশ দশক। গোষ্ঠবাবুর তখন অবিভক্ত বাংলা জুড়ে বিস্তর নামডাক। এমন সময় তিনি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। প্রায়ই তাঁকে কোর্টে আসতে হতো। গোষ্ঠবাবুর হয়ে আদালতে তখন কেসটা দেখছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার ৺দ্বিজেন বসু। মামলার শেষদিকে এমন অবস্থা হলো গোষ্ঠবাবুকে প্রতিদিন হাইকোর্টে যেতে হলো। প্রায়ই দেখা যেতো তিনি সারাটা দিন আদালতে বসে আছেন। ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টি এড়ালো না। শ্বেতাঙ্গ উকিলদের কানাকানিতে কথাটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলো স্বয়ং জজ মিষ্টার গ্রীভসের কানে। বিচারপতি গ্রীভস তখন ছিলেন আই. এফ. এ.-র সভাপতি। গোষ্ঠবাবুকে তিনি ভালোমতোই চেনেন। ব্যাপারটা তার কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি ডেকে পাঠালেন ব্যারিষ্টার বোসকে। বিচারপতির ডাক পেয়ে দ্বিজেনবাবু হাজির হলেন।

রাশভারি গ্রীভস বললেন—"শুনলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রত্যেক দিন নাকি কোর্টে আসছেন মিষ্টার পল? কি হয়েছে ওঁর? —কিসের মামলা?"

বিচারপতি গ্রীভসের কথা শুনে ব্যারিষ্টার দ্বিজেনবাবু গোষ্ঠ পালের মামলার বৃত্তান্ত তাঁকে বললেন। সমস্ত কথা শুনে বিচারপতি গ্রীভস বললেন—"এই সামান্য ব্যাপার কোর্টে উঠতে এতো দেরি হচ্ছে কেন? এক কাজ করুন, আপনি আপনার ওপনেন্ট মিষ্টার রায়কে (তড়িৎ রায়) একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। মামলাটি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়ে যাক, এটাই আমার ইচ্ছে। মিষ্টার পলের মতো একজন ফুটবলারের প্র্যাকটিশ ছেড়ে এই ভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়—এতে ওঁর খেলার ক্ষতি হতে পারে।"

একজন গ্রেট খেলোয়াড় তাঁর গ্রেটত্ব বোঝাতে খুব একটা বেশী সময় নেন না। অল্প দিনের মধ্যে দশজন খেলোয়াড়দের মধ্যে স্বভাবে আচরণে, চরিত্রে এবং তাঁর অসাধারণত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়—যেমন ফুটবলের আঙ্গিনায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠবাবু নিজেকে অতি সহজে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সুকুলের পাশে খুব একটা বেশীদিন খেলার সুযোগ তাঁর হয় নি। ফুটবলের অনেকটা সময় তাঁকে খেলতে হয়েছে অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে। এদের কাছে গোষ্ঠবাবু ছিলেন একজন অভিভাবক। কেউ কোনো ভুল করলে গোষ্ঠবাবু কোনোরকম বকাবকি না করে শুধরে দিতেন। তাঁর কথাই ছিল, বকাবকি করে কাউকে শুধরোনো যায় না। তাই তাঁকে দেখেছি কোনো তরুণ খেলোয়াড় ভুল করলে বা তারা কোনো রকম ত্রুটি করলে তিনি নিজের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিতেন এবং খেলার শেষে তিনি তাঁদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। তাঁর এই আচরণের জন্য তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। হয়তো এই জন্য গোষ্ঠবাবুর সহযোগিতা পেয়েই কলকাতা মাঠে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন পান্না পরামানিক, আর দাস, সন্মথ দত্ত, সুধাংশু বোসের মতো ফুটবলারেরা। এঁদের প্রত্যেকের কাছে বর্ষীয়ান গোষ্ঠবাবু ছিলেন গুরু।

১৯২৫ সালের পর দলে নতুন খেলোয়াড়েরা যাতে জায়গা পান তার জন্য গোষ্ঠবাবু অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দল থেকে শরীরের অজুহাতে সরে থাকতেন।

সেকালের ফুটবলে কলকাতার লীগ ও শীল্ডের খেলা ছাড়াও বার্ষিক দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রদর্শনী ম্যাচের মধ্যে একটি ছিল ইউরোপীয়ান দল বনাম ইণ্ডিয়ান দল। অন্যটি ছিল সিভিলিয়ান দল বনাম মিলিটারী দলের মধ্যে খেলা। এই দুই প্রদর্শনী ম্যাচে গোষ্ঠবাবু ছিলেন একজন অপরিহার্য খেলোয়াড়।

১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় দল বনাম ইউরোপীয়ান দলের মধ্যে খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠবাবু এই প্রদর্শনী ম্যাচে বরাবরই ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। অন্যদিকে সিভিলিয়ান বনাম

মিলিটারি দলের মধ্যে খেলায় তাঁকে কোনো অবস্থায় বাদ দেওয়া তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই ম্যাচে দুর্ধর্ষ শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় বেনেট, কলভিনের মতো ব্যাকের পাশে সহযোগী খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে দেখা গেছে গোষ্ঠবাবুকে। অনেক ক্ষেত্রে সাহেব খেলোয়াড়দের সুবিধা বিবেচনা করে গোষ্ঠবাবুকে খেলতে হয়েছে অনভ্যস্ত জায়গায়। যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়ের সহযোগী হিসাবে গোষ্ঠবাবু খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে কলভিন সম্পর্কে গোষ্ঠবাবুর শ্রদ্ধা ছিল বেশী।

আবার ভারতীয় দল বনাম ইউরোপীয়ান দলের সঙ্গে খেলায় গোষ্ঠবাবু অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে দলথেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ১৯২৫ সালে গোষ্ঠবাবু জাফর আলি ও আর. দাসকে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নিজে টপ ফর্মে থাকা সত্ত্বেও দল থেকে সরে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন— "আমি জায়গা করে না দিলে ওরা খেলবে কি করে? ওদেরও তো খেলার দরকার আছে। আমার মতো বুড়ো-হাবড়া আর কতোদিন জায়গা আঁকড়ে থাকবে।"

১৯৩৩ সালে আই.এফ.এ. দল সিলোন সফরের আমন্ত্রণ পেয়েছিলো। সেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরে ভারতীয় দলের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু। সেদিনের এই নির্বাচিত দলে ছিলেন মোহনবাগানের গোষ্ঠবাবু সহ সামাদ, করুণা ভট্টাচার্য, স্পোর্টিং ইউনিয়ান দলের জে. সি. গুহ, নাসিম, এরিয়ান্স দলের ছোনে মজুমদার, এন. গাঙ্গুলী, মহামেডান দলের নূর, হাওড়া ইউনিয়ান দলের পদ্ম ব্যানার্জী, ডি. ঘোষ, এবং ভবানীপুরের মনা গুঁই। দলের ম্যানেজার ছিলেন শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ গুপ্ত। এই সফরে ভারতীয় দল ছ'টি ম্যাচ খেলে ছ'টিতেই জয়লাভ করেছিল। অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু, সামাদ, নূর, কে. ভট্টাচার্যের মতো ফুটবলারেরা। খালি পায়ে ভারতীয় দল যে এতো সুন্দর খেলতে পারে তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন সিলোনের ক্রীড়া রসিকেরা। প্রতিটি ম্যাচ শেষে তাঁরা সুখ্যাতি করেছিলেন গ্রেট গোষ্ঠ পালের।

পরের বছর ভারতীয় দলের কাছে এসেছিলো দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সুযোগ। এই সফরেও আই. এফ. এ. কর্মকর্তারা অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন গোষ্ঠবাবুকে। কিন্তু গোষ্ঠবাবু এই সফরে দলের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন—"দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তাঁর কাছে এই সফরে না যাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি স্পষ্ট ভাবে কোনো বক্তব্য রাখলেন না। কেবল বলেছিলেন—"আমার শরীর ভাল নয়, আমার পক্ষে জাহাজে ওঠা সম্ভব নয়।"

সত্যি কি তাই—গোষ্ঠবাবু অসুস্থ ছিলেন? না ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় গোষ্ঠবাবু সেদিন মোটেই অসুস্থ ছিলেন না। তাহলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করলেন না কেন? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গোষ্ঠবাবু সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণ বিদ্বেষী নীতির প্রতিবাদে এই সফর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছিলেন। যে দেশে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ অত্যাচারিত হয়, যে দেশে মনুষ্যত্বের কোনো মূল্য নেই, যে দেশ মানবতা-বাদের বিরোধী সে দেশে ফুটবল সফর করা তাঁর মতো একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে অনেক বুঝিয়েও যখন গোষ্ঠবাবুকে রাজি করানো গেল না, তখন বাধ্য হয়ে সন্মথ দত্তকে অধিনায়ক করে দল পাঠানো হলো আফ্রিকা সফরে।

জীবনে বহু সম্মানের অধিকারী মানুষটি নিজেকে জাহির করার চেষ্টা কোনোদিন করেন নি। তিনি যতো ভালো খেলতে পারতেন, ততো ভালো তিনি গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন না। তাই সব সময় চেষ্টা করতেন যুক্তি-তর্ক-বক্তৃতার মতো আত্মপ্রচারের মাধ্যমগুলোকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে। বরং কেউ তাঁকে অতি সম্মান দেখালে তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। কোনো কিছু প্রশংসা করলে বলতেন—"লোকে আমারে লয়ে একটু বেশী কথা কয়।"

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। সবেমাত্র খেলাধুলোয় আগ্রহী হয়েছি। তখন থেকে শুনে আসছি চাইনিজ ওয়াল গোষ্ঠ পালের কথা। দেশ তখন

স্বাধীন হয়েছে। ছাত্রাবস্থায় খেলার মাঠে নিয়মিত যাতায়াত করি। এই সময় কলকাতার মাঠ জাঁকিয়ে ফুটবল খেলছেন শৈলেন মান্না, পি. বড়ুয়া, বোমকেশ বসু, আমেদ খানের মতো খেলোয়াড়েরা। মাঝে মাঝে তাই মনে হতো, আমি যাঁদের চোখের ওপর দেখছি গোষ্ঠবাবু কি এঁদের তুলনায় অনেক বড়ো ফুটবলার ছিলেন? কতো বড়ো খেলোয়াড় ছিলেন তিনি? বয়স অল্প থাকায় সেদিনের জ্ঞানে তাঁকে আমার পক্ষে প্রকৃত মুল্যায়ণ করা সম্ভব ছিল না। তবে মনে মনে কল্পনায় মনে হতো মানুষটাকে দেখতে না জানি কি দশাসই চেহারা হবে। মনের গভীরে কল্পনায় তাই গোষ্ঠবাবুর একটা ছবি এঁকে ছিলাম। কাল্পনিক সেই মানুষটিকে চোখের ওপর প্রথম দেখেছিলাম আরও বছর পাঁচেক বাদে। তখন সবে আমি কলেজে ঢুকেছি। নিয়মিত খেলাধুলো করি ভবানী-পুরের একটা ক্লাবে। আমার প্রতিবেশী ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের একজন প্রাক্তন ফুটবলার পল্টু দাসগুপ্ত। পল্টুবাবু তিরিশ দশকের একজন সেরা বাঙালী খেলোয়াড়। তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই আসতে দেখেছি উমাপতি কুমার, ক্ষেত্র বোস, সতু চৌধুরী, নীরেন গাঙ্গুলীর মতো পুরানো দিনের বহু খেলোয়াড়দের। ওঁদের মুখেই শুনতাম সাহেব আমলের ফুটবলের গল্প। শুনতাম গোষ্ঠবাবু, সামাদ সাহেবের কথা। এমন একটি দিনে হঠাৎ করে পল্টুবাবুর বাড়ীতে আমার ডাক পড়লো। পল্টুবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে তৎক্ষণাৎ ছুটলাম। গিয়ে দেখি পল্টু-বাবুর বাড়িতে একজন ছোটোখাটো বলিষ্ঠ চেহারার প্রৌঢ় মানুষ চেয়ারের ওপর বসে আছেন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, হাতে ছাতা। পল্টুবাবু বললেন—"এই দেখ, কে এসেছেন আজ?"

আমি তো অবাক! কে এই মানুষটি? এঁকে তো এর আগে কখনও দেখি নি। আমি বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম মানুষটির দিকে। পল্টুবাবু বললেন—"কি রে, চিনতে পারলি না, ইনি হচ্ছেন তোদের গোষ্ঠ পাল।"

নামটা শোনা মাত্র বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। মনে হলো সমস্ত গোটা শরীরটা ধরে কে যেন ঝাঁকুনি দিলো আমায়। অস্ফুট স্বরে

বললাম—“এই গোষ্ঠ পাল। এতো সাধারণ!”

পায়ে হাত দিয়ে দ্রুত প্রণাম করলাম। গোষ্ঠবাবু আমায় পাশে বসালেন। জানতে চাইলেন—আমি কি করি, কোন্ খেলা খেলতে ভালোবাসি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দু-চার কথার পরই আমি বললাম—“আপনার কথা অনেক অনেক শুনেছি।”

তিনি আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে বললেন—“যা শুনেছো সব বানানো কথা। সবাই যা বলে আমি তা মোটেই ছিলাম না। তোমরা যাঁর কথা কম শুনেছো সেই সামাদ ছিলেন অনেক বড় প্লেয়ার। তোমরা যে আমেদ খাঁনকে এখন দেখছো, এই রকম দশটা আমেদখাঁনকে পকেটে পুরে রাখতে পারতনে সামাদ।” এই বলে তিনি এক নাগাড়ে সামাদ সাহেবের গল্প বলে গেলেন। বললেন, ইউরোপীয় ফুটবলার বেনেট, পিটার কলভিন, নাইট, ডালহৌসীর ডানকান প্রমুখ খেলোয়াড়দের কথা।

আমার জীবনের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। আজও মাঝে মাঝে স্মৃতি চারণের মুহূর্তে তাঁর সেই নির্লিপ্ত, নিরহংকার মুখটি চোখের ওপর ভেসে উঠে। মনে হয়, আমি কি সেদিন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তীর নায়কের মুখোমুখি হয়েছিলাম? নাকি সেদিন আমার চোখের ওপর দেখেছি একজন সত্যিকার মহান বাঙালী সন্তানকে?

পরবর্তীকালে প্রভাবতী প্রকাশনীর কর্ণধার শিবরাম কুমারের অনুপ্রেরণায় একটি ছড়ার বই আমি লিখেছিলাম। বইটির নাম—“ছড়া ও ছবিতে মহান সন্তান।” বলা বাহুল্য সেই বইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ মহান সন্তানদের মধ্যে স্থান দিয়েছিলাম গোষ্ঠবাবুকে। বইটি ছিল শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীদের নিয়ে ছড়ায় লেখা—তাঁরা কে কি কিসের জন্য বিখ্যাত। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শুনেছি প্রকাশক শিবরামবাবু গোষ্ঠবাবুর হাতে একটি কপি তুলে দিয়েছিলেন। নিজের বিষয়ে লেখা ছড়াটি পড়ে তিনি নাকি হাসতে হাসতে বলেছিলেন—“আরে

তোমরা তো দেখছি আমায় মহান সন্তান বানিয়ে দিয়েছো। আমি মহান সন্তান নই। আমি আবার মহান সন্তান হলাম কবে।"

নিজের সম্পর্কে তাঁর এই ধারণাই তাঁকে ভারতের মাটিতে মহান সন্তান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ময়দানের বুকে তাঁর মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে তাই মনে মনে ভারতীয় ফুটবলের দুরাবস্থার কথা ভেবে মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে—"তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ কর।"

গোষ্ঠবাবুর সময় ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগান ক্লাবের পরেই দ্বিতীয় বাঙালী ক্লাব হিসাবে শ্বেতাঙ্গ গোষ্টির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল স্যার দুখীরাম মজুমদারের এরিয়ান্স ক্লাব। মোহনবাগান ক্লাবের মতো এরিয়ান্স ক্লাবের পিছনে কোনো রাজ পরিবারের অনুগ্রহ ছিল না। স্যার একাই তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে ক্লাবটিকে বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন। তিনি শুধু সেই যুগের একজন ফুটবল শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন একজন বড়ো জাতের ফুটবলার। ভারতীয় ফুটবলের এমন একটা সময় গিয়েছে যখন বাঙালী ফুটবলার মাত্রই ছিলেন স্যার দুখীরামের ছাত্র। তবে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছোনে মজুমদার। দুখীরামবাবুর এই ক্লাবটির প্রতি গোষ্ঠবাবুর ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড় ও সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী হিসাবে এরিয়ান্স ক্লাবের জন্যও ছিলেন চিন্তান্বিত।

লীগের আসরে মোহনবাগান-এরিয়ান্স ভারতীয় দল হিসাবে সমসাময়িক। কলকাতার সাহেব দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে দুখীরামবাবুর দল কসুর করে নি। অথচ সেদিনের মানুষ মোহনবাগান ক্লাবকে যতোটা খাতির করেছে, এরিয়ান্সকে ঠিক ততোটা খাতির করে নি। এরিয়ান্স তখন ছিল উপেক্ষিত। এর জন্য স্যার দুখীরামের মনের মধ্যে খেদ ছিল। তিনি বলতেন—"আমরা ভালো খেলা সত্ত্বেও কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।"

শ্বেতাঙ্গ কর্তারা সুযোগ পেলেই চেষ্টা করেছে এরিয়ান্সকে দ্বিতীয়

বিভাগে নামিয়ে দেবার। একবার তো লীগে এরিয়ান্সের ছিল খুবই খারাপ অবস্থা। শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির মনে-প্রাণে ইচ্ছে ছিল এই বাঙালী দলটি যাতে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। এমত অবস্থায় এরিয়ান্স ক্লাবের খেলা পড়লো মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে। এরিয়ান্স ক্লাবের অবস্থার গুরুত্ব বিচার করে মোহনবাগান পয়েন্ট ছেড়ে দিল। ব্যাক ছেড়ে ফরোয়ার্ডে খেললেন এই ম্যাচে গোষ্ঠবাবু। মোহনবাগানের কাছ থেকে দুটি পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে সেদিন মান রক্ষা হলো এরিয়ান্স ক্লাবের। এর জন্য গোষ্ঠবাবুকে কম কথা শুনতে হয় নি। কিন্তু গোষ্ঠবাবুর তাতে থোড়াই কেয়ার। তিনি মোহনবাগান দলের অধিনায়ক। কাজেই এরিয়ান্সকে পয়েন্ট ছাড়ার ব্যাপারে যদি কারো কিছু বলার থাকেতাহলে যেন তাঁকে বলা হয়, অন্য কাউকে নয়।

গোষ্ঠবাবুর এই সিদ্ধান্তের জন্য সেদিন তাঁর দলের সমর্থকেরা যতো না ক্ষুব্ধ হলেন তার চেয়ে বেশী চটে গেলেন শ্বেতাঙ্গ কর্তা ব্যক্তিরা। আই. এফ. এ.-এর সভায় গোষ্ঠবাবুর এই আচরণের জন্য নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হলো। গোষ্ঠবাবু তাদের এই নিন্দা প্রস্তাবকে কোনো আমল না দিয়ে স্পষ্ট বললেন—"একজন বাঙালী খেলোয়াড় হিসাবে একটি বাঙালী দলের জন্য যা করা ন্যায্য বলে মনে করেছি, তাই করেছি। আমরা না দেখলে এরিয়ান্সকে কে দেখবে? স্যারের ক্লাবকে তো আমাদেরই দেখা উচিত।"

এমন ঘটনা একবার নয় বহুবার ঘটেছে। আসলে ভারতীয় হিসাবে ভারতীয়ানা বজায় রাখার ব্যাপারে গোষ্ঠবাবু ছিলেন হিমালয়ের মতো অটল। আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা এবং শাসক শ্রেণীকে সুযোগ মতো আঘাত করাই ছিল সেকালের ভারতীয় ফুটবলারদের অন্যতম আদর্শ যার প্রকৃত নায়ক ছিলেন স্বদেশী ভাবনায় জাগ্রত গণজাগরণের ফুটবল পথিকৃত গোষ্ঠ পাল।

ফুটবল মাঠ থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও গোষ্ঠবাবুর জনপ্রিয়তা কিন্তু কমে যায় নি। বরং তিনিই একমাত্র ভারতীয় ফুটবলার যিনি

ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার পঞ্চাশ বছর বাদেও জনপ্রিয়তার সঙ্গে ঠিক আগের মতোই মানুষের অন্তরে টিকে আছেন। একেই বলে কাল-জয়ী নায়ক। কালজয়ী না হলে এই আশি দশকে দাঁড়িয়ে মানুষ তাঁর জয়গান করে কি করে? ময়দানে তাঁর মূর্তি গড়ে আজও কেন লক্ষ লক্ষ ফুটবল প্রিয় বাঙালী তাঁর পাদদেশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় আত্মনিবেদন করে? কেন তাঁর মূর্তিটিকে সামনে রেখে ফিরে পেতে চায় বাঙালী মাত্র অতীতের গর্ব? কেন একটি আত্মবিস্মৃত জাতি জীবনের ভঙ্গুর মুহূর্তে ফেলে আসা অতীতের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেতে চায় জাতীয় মর্যাদা আর ঐতিহ্যকে? ময়দানের বুকে তাঁর মর্মর মূর্তিটি মনে হয় তাঁর বিরাট খেলোয়াড় জীবনের শুধু পরিপূর্ণ স্বীকৃতি নয়, তাঁর এই স্বীকৃতি একজন গণজাগরণের নেতা হিসাবে।

আগেই বলেছি ১৯৩৫ সালে গোষ্ঠবাবু ফুটবল থেকে সরে গিয়ে-ছিলেন। সরে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক কারণে। পরাধীন যুগের একজন ফুটবলার হয়ে তিনি শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠির নির্লজ্জ পক্ষ-পাতিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে খেলার মাঠে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাঙালী খেলোয়াড়দের শিখিয়েছিলেন, ফুটবল শুধু খেলা নয়, এই খেলার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনে কঠিন আন্দোলন চালাতে যুবশক্তির কাছে ফুটবল-ই হলো মস্ত হাতিয়ার।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ফুটবলার গোষ্ঠ পালের গুরুত্ব কিন্তু কমে যায় নি। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অগ্রজ সাংবাদিক ও প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রদ্ধেয় অজয় বসুর একটি লেখার উল্লেখ করছি।

"সেবার পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাব দল দিল্লীতে খেলতে গেছে। দলের সঙ্গে রীতিমতো বর্ষিয়ান বলতে আছেন ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী দলের হাবুল সরকার, কানু রায় এবং গোষ্ঠ পাল। ইয়ং ভেটারেন্স হিসাবে আমরাও রয়েছি। তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন। গোষ্ঠ পালদের দিল্লী আসার খবর অধ্যাপক কবীরের

মুখে শুনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এক সন্ধ্যায় ভেটারেন্সদের চা-চক্রের আমন্ত্রণ জানালেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দেখি চা-চক্র ইত্যাদি গৌণ ব্যাপার। আসলে রাষ্ট্রপতির যতো কথা গোষ্ঠ পালের সঙ্গেই। কী হৃদ্যতার সঙ্গেই না তিনি ঘরোয়া আলাপ জুড়ে দিলেন। গোষ্ঠ পালকে যেন ছাড়তেই চান না। আমরা অবাক হয়ে উপলব্ধি করছিলাম যে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের মনের কতোখানি জায়গা জুড়ে আছেন ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। পরে জেনেছিলাম যে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে রাজেন্দ্র প্রসাদ গোষ্ঠ পালের খেলা দেখেছেন অনেকবার। গোষ্ঠ পালকে কাছে পেয়ে রাষ্ট্রপতি তাই সেই পুরনো দিনের স্মৃতি-চারণই করছিলেন। বিশাল ভারতের প্রথম পুরুষের অন্তরে খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের যে সম্ভ্রমপূর্ণ স্নেহাসিক্ত আসন আছে, তা জেনে সেদিন আমরাও কম অভিভূত হই নি।"

শুধু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নয়, গোষ্ঠবাবুর ভক্ত ছিলেন সেদিন গোটা ভারতের প্রায় সমস্ত উচ্চস্থানীয় সর্বস্তরের সেরা ব্যক্তিরা। এই বাংলার বরেণ্য নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বারীন ঘোষ প্রমুখ রাষ্ট্র নায়কেরা ছিলেন গোষ্ঠবাবুর ভক্ত। কাজেই যে মানুষটি ফুটবল মাঠ ছাড়িয়ে জনপ্রিয়তায় দেশের বরেণ্য নেতাদের অন্তর স্পর্শ করার মতো যোগ্যতা রাখতেন তাঁকে নিশ্চয় শুধুমাত্র একজন ফুটবলার বলা যায় না।

আসলে গোষ্ঠবাবু ফুটবলার হয়েও স্বাদেশীকতার মন্ত্রে ছিলেন দীক্ষিত। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র দৃঢ়তা, নীতিবোধ, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেম তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলো ফুটবলের উর্ধে একজন মহান বাঙালী সন্তান হিসাবে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরকেও ফুটবলার গোষ্ঠ পাল গভীর ভাবে ছুঁয়ে ছিলেন। অনেকের ধারণা ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে নাকি ভারতীয় ফুটবল আন্দোলনের কোনো যোগ ছিল না। কথাটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ফুটবল আগ্রহী না হলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ফুটবল সম্পর্কে উৎসাহী

ছিলেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় তাই তিনি ছেলেদের খেলার জন্য প্রথমেই একটি ফুটবল মাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও পরে রথীন্দ্রনাথ আশ্রমের দায়িত্ব নেওয়ার পর আশ্রমে রীতিমতো একটি শক্তিশালী ফুটবল দল গড়ে ওঠে। সেই যুগে কলকাতার বহু নামী দল আশ্রমে যেতেন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য।

সেবার মোহনবাগান ক্লাব গিয়েছিল বোলপুর শান্তিনিকেতনে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে। শক্ত মাটিতে তৈরী মাঠে খেলার সময় আশ্রমের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হলেন গোষ্ঠবাবু। শুধু আহত হওয়া নয়, বেকায়দা পড়ে গিয়ে তিনি জ্ঞান হারালেন। তখন শান্তিনিকেতনে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে যা বোঝায় তাই ছিল। হাসপাতাল বলতে ছিল সিউড়িতে। বোলপুর থেকে সিউড়ির দূরত্ব অনেক। তখন ব্যবস্থা ভালো না থাকায় বোলপুর থেকে তাই সিউড়ির হাসপাতালে আহত গোষ্ঠবাবুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। আশ্রমের কাছাকাছি থাকতেন তখন পিয়ার্সন সাহেব। তিনি ছিলেন এই ম্যাচের উদ্যোক্তা। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। আহত গোষ্ঠবাবুর অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বয়ং কবি তখন বোলপুরে। তিনিও উদ্বিগ্ন। কালক্ষেপ না করে কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বললেন,গোষ্ঠবাবুকে যতো শীঘ্র সম্ভবশুশ্রূষার জন্য যেন পিয়ার্সন সাহেবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পিয়ার্সন সাহেবের বাড়িতে তখন অনেক কিছু ডাক্তারী সরঞ্জাম, ঔষধপত্র মজুত থাকতো।' গুরুদেবের আদেশ পাওয়ামাত্র রথীন্দ্রনাথ আশ্রম থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যবহৃত গাড়িতে করে সংজ্ঞাহীন গোষ্ঠবাবুকে নিয়ে গেলেন পিয়ার্সন সাহেবের বাড়িতে।

গভীর রাত পর্যন্ত গোষ্ঠবাবুর জ্ঞান না ফেরায় সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। খবর গেল কবির কাছে। কবি বাইরে উদ্বিগ্ন চিত্তে তখন পাইচারি করছিলেন। যখন শুনলেন, গোষ্ঠবাবুর অবস্থার কোনো

উন্নতি হয় নি তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সোজা সেই রাত্রেই তিনি আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে চলে এলেন পিয়ার্সন সাহেবের বাংলোয়।

ঐ গভীর রাত্রে কবির উপস্থিতিতে তো সবাই অবাক। থমথমে মুখে কবি গাড়ি থেকে নেমে পিয়ার্সন সাহেবের বাংলোতে প্রবেশ করলেন। তারপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"উনি কোথায় আছেন ?"

কবিকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। বিছানার ওপর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়েছিলেন গোষ্ঠবাবু। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ঘুমোচ্ছেন। কবি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন শায়িত গোষ্ঠবাবুর দিকে। দাঁড়ালেন এসে তাঁর মাথার কাছে। দু-চোখে অপলক দৃষ্টি। উপস্থিত সকলে নীরব। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কবি সন্তর্পণে বসলেন গোষ্ঠবাবুর মাথার কাছে। তারপর হাত রাখলেন তাঁর কপালে। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। শান্ত সৌম্য মানুষটি বহুক্ষণ একজন খেলোয়াড়ের শয্যার পাশে বসে তাঁর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। সেই স্পর্শে কি যাদু ছিল ? উপস্থিত সকলে সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন একটি অলৌকিক ঘটনা। কবির স্পর্শে ধীরে ধীরে অসাড় শরীর উষ্ণতায় আবার নতুন করে স্পন্দিত হলো। আধ ঘণ্টা সময় চুপচাপ রুগীর সেবা করে কবি ঘর ছাড়লেন। তারপর গাড়িতে ওঠার আগে রথীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন—"মনে হয় বিপদ কেটে যাবে। তুমি এখানেই থাক। ওর জ্ঞান ফিরলে আমাকে একটা খবর দিও।" কবি চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন গোষ্ঠবাবু চোখ মেলে তাকালেন।

অচৈতন্য অবস্থায় কবি যে তাঁকে সেবা করে গেছেন এই কাহিনী পরে শুনেছিলেন গোষ্ঠবাবু। তিনি তাঁর উপলব্ধি থেকে পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন—"আমি সেদিন দেবতার স্পর্শ পেয়েছিলাম। স্বর্গের দেবতা মর্তে নেমে এসে আর্তজনের যে সেবা করেন, এ যেন তাই। এ একটা অলৌকিক ঘটনাই বটে। শান্তি-

নিকেতনে তীর্থ করতে গিয়ে আমি তীর্থ দেবতার পুজো করতে পারি নি বদলে তীর্থের দেবতাই আমার সেবা করেছেন—এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর আমার জীবনে কি থাকতে পারে ?" গোষ্ঠবাবুর ভাষায়—"দেবতার স্পর্শই আমায় সেদিন মৃত্যুর কোল থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। আমার জীবনে এটাই হলো সব চেয়ে বড়ো পাওয়া।"

আগেও বলেছি, আবার বলি, স্বাধীন ভারতে ফুটবলের রীতিনীতি অনেক বদলে গেছে। এখন খেলোয়াড়দের কাছে খেলা শুধু খেলা নয় —খেলার মাধ্যমে এসেছে অর্থ রোজগারের প্রবণতা। ফলে আগের দিনের খেলোয়াড়দের মতো বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে না আছে কোনো আন্তরিকতা না আছে ক্লাবপ্রীতিবোধ। এখন তো টাকার জন্য বছর বছর ক্লাব বদল করা খেলোয়াড়দের কাছে একটা অভ্যস্ত আচরণ হয়ে উঠেছে। না হয় মানা গেল পেশার জগতে ফুটবল যখন একটি মাধ্যম, তখন অর্থ রোজগারের প্রবণতাই সেখানে তীব্র হবে—কিন্তু তা বলে খেলোয়াড়দের ন্যূনতম খেলোয়াড়োচিত আচরণগুলো ভুলে গেলে চলবে কি করে ? এখন 'স্পোর্টসম্যানশীপে'র তুলনায় খেলোয়াড়দের কাছে 'গ্রাউণ্ডম্যানশীপ'-ই বড়ো হয়ে উঠেছে। খেলার মধ্যে তাই বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না খেলোয়াড়দের সহজাত আন্তরিকতা, ক্লাবপ্রীতিবোধ কিংবা সচেতন নীতি অথবা বৃহত্তম ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধের ন্যূনতম উপলব্ধি। পরাধীন যুগে কিন্তু ফুটবলের মূলকেন্দ্রবিন্দু তা ছিল না। ছিল আদর্শ, ন্যায়, নীতি বোধের সচেতন উপলব্ধি, ক্লাবপ্রীতি, দেশপ্রীতিবোধ এবং সর্বোপরি স্বদেশ ভাবনা। ফলে সেই যুগের ফুটবলারেরা অর্থের কাছে দাসত্ব না করে, বিদেশী শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে ফুটবলের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে যেমন ঐক্যবদ্ধ হতে শিখিয়েছিলেন, তেমনি তাদের স্বদেশ ভাবনায় উজ্জীবিত করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। ফুটবল মাঠে সেদিন বাঙালী ফুটবলার মাত্রই ছিলেন একজন খাঁটি স্বদেশী, যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রথম পিছু হটতে শুরু করেছিল শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠি। এই ফুটবল মাঠ থেকেই পরাধীন ভারতে প্রথম শোনা গিয়েছিল জনগণ চিত্তে নবজীবনের জয়গান। বিশ-তিরিশ

দশকে যে মানুষটি, সমগ্র পরাধীন জাতির মনে বিদেশীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস এনে দিয়েছিলেন, সমগ্র বাঙালীর সংগ্রামী চেতনাকে যিনি নয়া প্রেরণায় শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি যুগিয়েছিলেন, বোমা পিস্তল হাতে স্বদেশীদের তুলনায় যার নগ্ন পায়ের ফুটবল বিদেশী শাসক সমাজের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল—সেই মানুষটি হলেন ভারতবাসীর হৃদয়ের মানুষ ও সেরা বাঙালীর একজন—গোষ্ঠ পাল। হয়তো সেই কারণে ময়দান থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বিদায় নিয়েও স্বাধীন ভারতের নয়া পটভূমির মধ্যে ফুটবলের নবতম মূল্যায়ণে আমরা উত্তরকালের ফুটবলপ্রিয় মানুষ, তাঁকেই চিহ্নিত করেছি পরাধীন যুগের একজন সত্যিকার 'গণজাগরণের নায়ক' হিসাবে।

একালের ময়দানে আগের মতোই ফুটবল আছে। আছে সেই সব ঐতিহ্যবাহী ক্লাব, আছে ফুটবলপ্রেমী মানুষ—শুধু নেই গোষ্ঠবাবুর মতো একজন সত্যিকার সাহসী, সংগ্রামী, আদর্শ, নীতিজ্ঞান সচেতন, ক্লাবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক, ফুটবলার—যাঁর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে তরুণ খেলোয়াড়েরা। তাই ফুটবলের চরম ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে, ফুটবল বিধ্বস্ত বাংলার ঐতিহ্য গরিমার অবলুপ্তি পরিলক্ষিত করে, ভারতীয় ফুটবলের অভিশপ্ত অবক্ষয়ের দুর্দিন উপলব্ধি করে, ভারতের ফুটবলপ্রেমী মানুষেরা আবার তাঁকে নতুন করে স্মরণ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার—যাঁরা ময়দানে তাঁর মর্মরমূর্তি স্থাপন করে, তাঁর জন্ম দিনটিকে "ফুটবল দিবস" হিসাবে উৎযাপিত করে বাংলার মানুষকে আর একবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে চান—গোষ্ঠ পাল নামক একজন ফুটবল খেলোয়াড়টি এই বাংলার মাটিতে জন্মেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা, আদর্শ, নীতিজ্ঞান এবং সর্বোপরি খেলোয়াড়োচিত আচরণ ও দেশাত্মবোধ ছিল একদা বাংলার যুবশক্তির প্রেরণা এবং বাংলার ফুটবল প্রাঙ্গণের প্রাণশক্তি। অধুনা বাংলার ফুটবলের এই দুর্দিনে আর একবার পবিত্র চিত্তে আমরা তাঁর নাম মন্ত্র উচ্চারণে শপথ গ্রহণ করি, দেখি নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আদর্শ ও নৈতিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আবার

বাংলার ফুটবলকে তার নিজস্ব গরিমার পথে আমরা চালিত করতে পারি কিনা। যদি বর্তমানের হতাশা, ব্যর্থতা, দুর্নীতি, ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ নগ্নতা থেকে আমরা অতীতের ঐতিহ্যবাহী দলগুলিকে শুভচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি, যদি প্রতিটি খেলোয়াড়ের অন্তরের অন্তঃস্থলে জাতীয়তাবোধ সক্রিয় চেতনার জাগ্রত হয়, যদি সমর্থকেরা ক্লাবপ্রীতির অন্ধত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন, যদি বাংলার ময়দানে আবার সত্যিকার ফুটবল লড়াই ফিরে আসতে পারে, যদি মাঠ ময়দানে আবার হৃদয়বান, চরিত্রবান ও ফুটবলপ্রিয় সংগঠকদের আবির্ভাব ঘটে, তাহলেই হয়তো ভবিষ্যতে বাংলার ফুটবল আবার তাঁর গরিমাকে ফিরে পেতে পারে, নচেৎ ফুটবল বর্তমানে যে পথে চলেছে, তাতে সরকারি উদ্যোগে যতই শুভচেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বাংলার মানুষকে উৎসাহী করার চেষ্টা করা হোক না কেন, বাংলার ফুটবলের কোনো উন্নতি সম্ভব হবে না। বরং দিনে-দিনে বাংলার মানুষ হয়ে উঠবেন ময়দান বিমুখ। কেবলময়দানের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতিভারে ক্ষতবিক্ষত হবে একটি মর্মরমূর্তি, শোনা যাবে তাঁর অন্তরভেদী ক্রন্দন—“হায়রে বাঙালী, এই ফুটবল আমি চাই নি, তোমরা তোমাদের গোষ্ঠ পালকে ভুলে যাও—আমারে ভারমুক্ত কর।”

গোষ্ঠবাবু আজ নেই। বছর দশেক হলো তিনি ইহকালের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। অথচ তাঁর মৃত্যুর দশ বছর বাদেও বাঙালী জাতি আত্মবিস্মৃতির অপবাদ থাকা সত্ত্বেও পারে নি তাঁকে উপেক্ষা করতে। বরং বর্তমানে ফুটবলের দুর্দিন যতো বাড়ছে, ততো বেশী করে যেন তাঁকে আমাদের মনে পড়ছে। সমকাল উত্তীর্ণ এই মানুষটি তাই হয়ে উঠেছেন বাঙালী তথা বাঙালীর ফুটবল ভাবনার কাছে একমাত্র মন্ত্রশক্তি।

ফুটবলের প্রতি যে ভালোবাসার অভাব আধুনিক ফুটবলকে অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, যাদের অন্তসারশূন্য অহংকারের বাহুল্যতায় বাংলার ময়দান দিন-দিন কলুষিত হয়ে উঠেছে, যাদের

আন্তরিকতা ও আদর্শের অভাবে আজ বাংলার যুবশক্তি ময়দান বিমুখ হয়ে উঠেছে—একদিন কিন্তু এই ময়দানেই ফুটবল খেলে সমগ্র জাতিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন গোষ্ঠবাবু। ফুটবলকে ভালোবেসে ফুটবলের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন দেশের সমস্ত যুবশক্তিকে জাগ্রত করতে, তাদের কল্যাণ পথে চালিত করতে, মুক্তির সংগ্রামে শপথ নিতে। নিজের ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা ও গরিমাকে মূলধন করে তিনি কোনো দিন চান নি নিজের ক্লাব অথবা কোনো সংস্থার উচ্চতম পদের আসনটিকে দখল করতে। শুধু গোষ্ঠবাবু কেন সেই যুগের যাঁরা সেরা খেলোয়াড়, তাঁদের কারোর মধ্যেই ব্যক্তিত্বের মিথ্যে অহমিকা ছিল না। এখন প্রায়ই অনেক খেলোয়াড়কে বলতে শোনা যায়—"আমি অমুক দলের হয়ে এতো কিছু করেছি অথচ ক্লাব আমাকে যোগ্য সম্মান দিলো না। আমাকে তো ক্লাবের সম্মান দেওয়া উচিত ছিল। আমি তো ওই ক্লাবের হয়ে এতো বছর খেলেছি, অনেক ট্রফি ক্লাবকে পাইয়ে দিয়েছি।" যাঁরা একথা বলেন, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁরা যদি বর্তমান ক্লাবগুলি থেকে কিছু না পেয়ে থাকেন, তাহলে কি তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছেন অতীত দিনের খেলোয়াড়েরা? তাঁরা তো আন্তরিকতা নিয়ে কেবলমাত্র ক্লাবকে ভালোবেসে নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে মাঠে খেলতে আসতেন। একবার চিন্তা করে দেখুন তো, গোষ্ঠবাবু, সামাদ, কুমারবাবু, করুণাবাবু প্রমুখ দিকপাল, বরেণ্য বাঙালী খেলোয়াড়দের কথা—তাঁরা কি পেয়েছেন? কি পেয়েছিলেন সর্ব ভারতীয় দল হিসাবে আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ী বাংলার বরেণ্য ফুটবলারেরা, যাঁরা একটি পরাধীন জাতিকে জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন? কি পেয়েছেন ক্লাবের জন্য, ফুটবলের জন্য সর্বস্ব বিকিয়ে দেওয়া মানুষ স্যার দুখীরাম মজুমদার, ছোনে মজুমদার, ন্যাশানাল ক্লাবের মন্মথ গাঙ্গুলী, শোভা বাজার ক্লাবের কে, সি, মোহন-বাগান ক্লাবের শৈলেন বসু, ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণপুরুষ নলিনী মিত্র (নানীবাবু) অথবা পঞ্চাশ দশকের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জে. সি. গুহ? এখন কি বাংলার ময়দানে এঁদের মতো একজনও সত্যিকারের ক্লাব

দরদী কেউ আছেন, যাঁরা বুক বাজিয়ে বলবেন—"আমরা যোগ্যতায়, আদর্শে, নিষ্ঠায়, স্যার দুখীরাম, শৈলেনবাবু অথবা জে. সি. গুহের সমতুল্য।"

ষাট দশক পর্যন্ত বাংলার ফুটবলের তবু একটা ধারাবাহিকতা ছিল। দেখা গিয়েছিল সেই সময়ে বেশ কিছু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে, যার তুলনায় সত্তর-আশির দশক একেবারেই নিষ্প্রভ বলা যায়। ফলে ব্যক্তিত্বের, সমতার ও নিষ্ঠার অভাবে বর্তমানে বাংলার ফুটবল এসে দাঁড়িয়েছে মৃতপ্রায় অবস্থায়। এই যুগের ময়দানে অর্থ আছে, নেই আন্তরিকতা, নেই সত্যিকার একজন ফুটবল সংগঠক ও ফুটবলার—যার আদর্শের ওপর ভর করে বিক্ষিপ্ত যুব সমাজ আবার নতুন করে জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

কেন এমনহলো, যদি এই প্রশ্ন করা যায়, তাহলে একালের যাঁরা ক্রীড়া রসিক, তাঁরা বলবেন—"এটা হলো যুগধর্ম মশাই। আপনি একালে বাস করে সেকালের মনোবৃত্তি নিয়ে চললে প্রকৃত ফুটবলকে মুল্যায়ণ করবেন কি করে? যে যুগের যা ধর্ম সেই ধর্ম তো মেনে চলতেই হবে।" হ্যাঁ, কথটা মানছি—সেকালের দিনে প্রচারের বাহুল্যতা ছিল না, একালের দিনে সেই বাহুল্যতা বেড়েছে। এই যুগ বিজ্ঞাপনের যুগ, তাই ক্লাব থেকে শুরু করে সংগঠন, কর্মকর্তা, খোলোয়াড় সবাই চাইছেন নিয়মিত ভাবে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করতে। রঙিন পত্র-পত্রিকায় এখন খেলোয়াড়দের ছবি ছাপা হচ্ছে সিনেমার হিরোর স্টাইলে, অথচ সেই পুরনো যুগে এসবের কোনো বালাই ছিল না। ছিল না ফুটবলকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা। সেই পুরোনো মানসিকতা বদলে খেলোয়াড়দের পেশাদার বৃত্তি না হয় সমর্থন করা যায়, তা বলে মাঠ ময়দানে যে অখেলোয়াড়োচিত আচরণ এখন অহরহ ঘটছে সেই ঘটনাগুলিকে কি আমাদের যুগধর্মের দোহাই দিয়ে নীরবে স্বীকার করে নিতে হবে? ফুটবল মাঠে একজন ফুটবলারের ধর্ম সকল যুগেই থাকে একই রকম। ফুটবলের মূল ধর্ম কোনো অবস্থার মধ্যেই পরিবর্তন-শীল নয়। ফুটবল শাস্ত্র কখনোই শেখায় না খেলোয়াড়কে খেলোয়াড়ো-

চিত আচরণকে পরিত্যাগ করতে। মাঠের মধ্যে দু-চারটে টুকরো ঘটনা সব যুগেই ঘটেছে, তা বলে ক্লাবে-ক্লাবে, সমর্থকে-সমর্থকে, খেলোয়াড়ে-খেলোয়াড়ে এতো বিরোধ সেই যুগে ছিল না। এখন মাঠে কোনো বড় দলের একজন নামী খেলোয়াড় বাজে খেললে তাঁকে কিছু বলার অধিকার কারো নেই। সমর্থকেরা গ্যালারী বসে যদি উত্তেজিত হয়ে গালমন্দ করেন, তাহলে দেখা যায় সেই খেলোয়াড়টি পাল্টা উত্তেজিত ভাবে দর্শকদের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন, কখনও বা বিশ্রিভাবে সমর্থকদের পাল্টা গালিগালাজ করছেন। দলের সিনিয়ার খেলোয়াড় হিসাবে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে সমস্ত দায়-দায়িত্ব অনায়াসে চাপিয়ে দিচ্ছেন একজন জুনিয়ার খেলোয়াড়ের ওপর, অথবা, বিপক্ষের কোনো তরুণ খেলোয়াড় ভালো খেললে তাঁকে উৎসাহিত করার বদলে আঘাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে—এই আচরণগুলি কি একজন আত্মসচেতন বড় ফুটবলারের স্পোর্টস্‌ম্যানশীপের যথার্থ লক্ষণ ?

আমার এহেন মন্তব্যে যারা ক্ষুব্ধ, তাদের বলি, গোষ্ঠবাবুর যুগেও গ্যালারীর মানুষ দলের পরাজয়ে উত্তপ্ত হয়েছেন। সমর্থকেরা দলীয় খেলোয়াড়দের টিপ্পনি কেটেছেন অথচ ব্যক্তিত্বের অহেতুক মিথ্যে অহংকার আস্ফালনে তাঁরা কেউ সমর্থকদের দিকে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন নি। বরং একজন খাঁটি স্পোর্টসম্যান হিসাবে দলের ব্যর্থতাকে নিজের ব্যর্থতা বলে স্বীকার করে নিয়ে সমর্থকদের গঞ্জনা তাঁরা নীরবে সহ্য করেছেন। আসলে সেদিনের ফুটবলারদের কাছে ফুটবল ছিল ভালোবাসার সামগ্রী, ক্লাব ছিল নিজস্ব পরিবার, আর ক্লাব সমর্থকেরা ছিলেন খেলোয়াড়দের পরিরারের একজন-আপনজন। তাই দেখেছি, "গোষ্ঠবাবুর মতো মানুষকে যখন জনতা বিদ্রূপ করেছেন, তখন তিনি মাথা হেঁট করে বলেছেন—ওঁরা তো বিদ্রূপ করবেই। ওঁরাই তো আমাদের বড় করেছে, জাতীয় বীর বানিয়েছে, তাই আমাদের খেলার সমালোচনা করার অধিকার তাঁদের আছে। অনেক আশা নিয়ে, অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা মাঠে খেলা দেখতে আসে, সেই আশা ভঙ্গ হলে রাগ হওয়াই তো স্বাভাবিক। তাঁরা যদি রেগে গিয়ে

একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলে, তাহলে তাদের সেই অধিকারটুকু আমাদের প্রসন্ন চিত্তে মেনে নেওয়াই হলো কর্তব্য। ওরা আছে বলেই তো আমরা আছি।"

একবার বুকে হাত রেখে এই যুগের কোনো ফুটবলার বলুনতো, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দলের সমর্থকদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন কি না ? যদি এই মানসিকতা একালের খেলোয়াড়দের মধ্যে সামান্য পরিমাণ থাকতো, তাহলে হয়তো কলকাতার ময়দানকে এমন ভাবে কলুষিত হতে হতো না। ঐতিহ্যবাহী বাংলার দলগুলিকে গরিমা বর্জন করে আদালতের কাঠগোড়ায় গিয়ে আসামীর মতো দাঁড়াতে হতো না—এযে বাংলার ফুটবলের পক্ষে কতো বড় লজ্জার তা বাঙালী মাত্র মনে প্রাণে অনুভব করেন বলেই আমার বিশ্বাস। যদি এই অবস্থা কলকাতা ময়দানে চলতে থাকে তাহলে কলকাতা ফুটবলের স্বর্গীয় আকর্ষণ শুধু যে কমে যাবে তাই নয়, সেই সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে ঐতিহ্যবাহী বাংলার ফুটবলের—অথচ এই বাংলাই একদা বৃহৎ ভারতে ফুটবল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ভুলে যেতে হবে বাঙালীকে, এই বাংলার ময়দানই ছিল ভারতীয় ফুটবলের তীর্থভূমি—যে তীর্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতাটি ছিলেন—দেশবরেণ্য ফুটবলার মহানায়ক গোষ্ঠ পাল।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী গোষ্ঠবাবু ফুটবল ময়দান থেকে সরে গেলেও ময়দানকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন নি। মাঠে নিয়মিত আসতেন, দলের খেলা দেখতেন, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন। ব্যাপারটা অনেকটা ছিল নেশার মতো। ময়দানের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ, ক্লাব ছিল তাঁর কাছে মায়ের মতো। ক্লাবের জয়ে তিনি যেমন আনন্দিত হয়েছেন আবার তেমনি ক্লাবের পরাজয়ে, ব্যর্থতায় ব্যথিত হয়েছেন। তা বলে তিনি অযাচিত ভাবে কখনও মুখ খোলার চেষ্টা করেন নি। বরং কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—"আমাদের সময়ে ফুটবলের ধরন ছিল একরকম আর এখনকার

ছেলেদের কাছে ফুটবলের ধরন অন্যরকম। আমি সেকেলে লোক হয়ে একালের ছেলেদের উপদেশ দেবো কি করে, আর তাঁরা আমার কথা শুনবেই বা কেন?" তা বলে উপদেশ যে তিনি কাউকে দিতেন না, তা নয়, দিয়েছেন, তবে দিয়েছেন শুধু তাঁদের যাঁরা তাঁর কাছে সত্যিকার হৃদয়ের আন্তরিকতা নিয়ে কিছু জানতে চেয়েছেন। অথচ ব্যক্তিত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত মানুষটি কিন্তু অনায়াসে পারতেন খেলা থেকে বিদায় নেওয়ার পর ক্লাবের বড় চেয়ারটি দখলের লড়াইতে যোগ দিতে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই চেষ্টা তিনি কোনোদিন করেন নি। বরং নিজেকে তিনি এই কলহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ভালো-বাসতেন। মোহনবাগান ক্লাব ছিল তাঁর কাছে আদর্শ, স্বপ্ন, তাঁর চিন্তার প্রতিফলন, সেই কারণে তিনি মোহনবাগান নামক ক্লাবটিকে বুকের রক্ত দিয়ে ভালোবেসেছিলেন।

এখন প্রশ্ন, যে মোহনবাগান ক্লাবকে গোষ্ঠবাবু বুকের রক্ত দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, বিশ-তিরিশ দশক জুড়ে যে মানুষটি মোহনবাগান ক্লাবের গরিমাকে আপন ব্যক্তিত্ব মহিমায় জাতির অন্তরে স্থান করে দিয়েছিলেন—সেই মোহনবাগান ক্লাব তাঁকে কি দিয়েছে? ময়দানের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা সবাই জানেন, গোষ্ঠবাবুকে মোহনবাগান ক্লাব কোনোদিনই উপযুক্ত সম্মান দেয় নি। অবশ্য তার জন্য গোষ্ঠবাবুর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। বরং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ক্লাবকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবেসে গেছেন—এমন করে একটি ক্লাবকে একালের ক'জন খেলোয়াড় ভালোবাসতে পারেন?

এই প্রসঙ্গে আমি প্রখ্যাত সাংবাদিক শঙ্করবিজয় মিত্রের একটি রচনার উল্লেখ করছি। অগ্রজ সাংবাদিক তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন—

"মনে পড়ে একদিনের কথা, তখন ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান মাঠ ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। খবর এলো গোষ্ঠবাবু যিনি ১৯১২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তিনি নাকি ক্লাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছেন। গোষ্ঠবাবুর মতো নির্লোভ ব্যক্তির

সঙ্গে কি এমন ঘটনা ঘটেছে যার জন্য খেলার মাঠে এই বিরাট আন্দোলন ও ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে? সাংবাদিক হিসাবে কর্তব্যের খাতিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এরিয়ান্স মাঠে, এরিয়ান্স তাঁবুতে। জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম সংবাদ অমূলক নয়। হঠাৎ দেখি তাঁর স্বর কাঁপতে লাগলো, আমায় বললেন—'যে ক্লাবের জামা পরে এতোদিন খেলেছি তার সঙ্গে যে আমার নাড়ির সম্পর্ক। তাকে কি মন থেকে মুছে ফেলা যায়? ঐ রক্ত আমার শরীরে মিশে রয়েছে। ওদের সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়েছে, নাই বা গেলাম সেখানে। ওদের খেলা আমি দেখবো। ওদের জয় গান করবো। করবো ওদের কল্যাণ কামনা। না ভাই, আমি কোনোও বিবৃতি দিতে পারবো না। ওদের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে বলে তো আমি ওদের বৈরী ভাবতে পারবো না'।"

আসলে গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে সেদিন মোহনবাগান ক্লাবের বিরোধ ছিল আদর্শের, ন্যায়-নীতির। মোহনবাগান তার নিজের মাঠ ছেড়ে ক্যালকাটা মাঠে উঠে গেছে—এই স্থানান্তরকরণকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর কাছে মোহনবাগান ক্লাবের পুরানো মাঠ, পুরানো তাঁবুই ছিল দেবমন্দির—তিনি সেই মন্দিরকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তাই মোহনবাগান ক্লাব ক্যালকাটা মাঠে উঠে যাওয়ার পর আর একটি দিনের জন্যও তিনি এই তাঁবুতে যান নি। তাঁর কাছে মোহনবাগানের নতুন মাঠ, নতুন তাঁবু অপেক্ষা পুরানো মাঠ, পুরানো তাঁবু ছিল ফুটবলের প্রকৃত তীর্থভূমি। এই মাঠেই পরাধীন যুগে তিনি তাঁর সতীর্থদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর কথা হলো সি. এফ. সি. মাঠ তো শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠির আড্ডাখানা। এই মাঠে তাঁর পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই আদর্শ, ন্যায়-নীতি সচেতন তেজী মানুষটি শেষ দিকে ময়দানে আড্ডা দিতেন স্যার দুখীরাম মজুমদারের এরিয়ান্স ক্লাবে বসে। তাঁর কথাই ছিল—"যে মাঠে আমি ফুটবল খেলা শিখেছি, যে মাঠে আমি দীর্ঘদিন ফুটবল খেলেছি, যে মাঠে ফুটবল খেলে আমি

যশের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছি, সেই মোহনবাগানের পুরানো মাঠকে আমি ত্যাগ করবো কি করে? এ যে আমার খেলোয়াড় জীবনের পীঠস্থান। এখন আমি আমার মোহনবাগান মাঠে যাই না বলে কেউ যেন মনে না করেন আমি ক্লাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, আসলে আমার সঙ্গে ক্লাবের যে বিরোধ তা আদর্শের, অন্তরের নয়।"

গোষ্ঠবাবুর এই কথাগুলি যে কতোখানি সত্যি ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর একটি লেখার মধ্যে। 'মোহনবাগান ক্লাব' প্রসঙ্গে গোষ্ঠবাবুর একটি অমর ও মূল্যবান লেখা মোহনবাগান ক্লাবের সৌজন্যে 'খেলার কথা' পত্রিকার বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় ১৯৭৯ সালের ১লা জুলাই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ক্লাব দরদী, সংগ্রামী মানুষটির হৃদয়ের আন্তরিকতা বোঝাতে সেই অমর লেখাটিকে পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি, যা অনুধাবন করলে পাঠক মাত্রেই বোঝা সম্ভব হবে—গোষ্ঠ পাল নামক খেলোয়াড়টি কতোটা সৎ, ন্যায়নীতি সম্পন্ন এবং সর্বোপরি ক্লাব দরদী ছিলেন।

"মোহনবাগান : গোষ্ঠ পাল

মোহনবাগান! এই অসাধারণ নামটি মনে করিয়ে দেয় একটি অসাধারণ বছরকে—১৯১১। সে বছরের শীল্ড বিজয় প্রত্যেক ভারতীয়ের বুকের উচ্চতা অন্ততঃ এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই জয় শুধু মোহনবাগান বা বাংলার ছিল না, গোটা ভারত এর জন্য গর্বিত হয়েছিল।

অন্য অনেক কিশোরের মতো আমিও তখন উত্তর কলকাতার কুমারটুলি পার্কে ফুটবল খেলি। তার কিছুকাল আগে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলা থেকে কলকাতায় এসেছি। মোহনবাগানের ঐ জয় আমাকে দারুণ অনুপ্রাণিত করল। সেইদিন থেকেই সংকল্প করলাম, একদিন এই মোহনবাগানে খেলতে হবে এবং সাহেবদের সঙ্গে লড়তে হবে।

আশ্চর্যের কথা, মাত্র দু'বছরের মধ্যেই সেই সুযোগ এসে গেল। ক্লাবের তখনকার সাধারণ সম্পাদক সুবেদার মেজর শৈলেন বসুর নজরে পড়ে যাওয়ায় ১৯১৩ সালে মোহনবাগানে খেলার ডাক পেলাম।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাঁধায় শৈলেন বসু চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, ক্লাবের দায়িত্ব নিলেন তাঁর অনুজ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

১৯১৪ সালে মোহনবাগান কলকাতা ফুটবল লীগ খেলতে শুরু করে, দ্বিতীয় ডিভিশনে। প্রথম বছরেই মেসারার্স ক্লাবের সঙ্গে আমরা জয়েণ্ট চ্যাম্পিয়ন হলাম। আই. এফ. এ.-র সিদ্ধান্তে আমরা প্রথম ডিভিশনে উঠলাম।

পরের বছর, প্রথম ডিভিশনে প্রথম খেলাই পড়ল শক্তিশালী ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে। সেই থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত একটি ক্লাবের হয়েই খেলেছি—মোহনবাগানে।

মোহনবাগানে আমার এই পঁচিশ বছর কেটেছে গভীর আনন্দে। ভালো খেলেছি বলে নয়, অনেক প্রতিভাধর খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি বলেও নয়, আমি সবচেয়ে গর্বিত এই ক্লাবের পতাকাকে আরো উর্ধে তুলে ধরতে পেরেছি বলে। একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে মোহনবাগানের ফুটবলার হিসাবে জীবনে যে সম্মান পেয়েছি, অন্য কোনো ক্ষেত্রেই আমার মতো সাধারণ লোকের তা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

একটা কথা বলা খুবই দরকার, মোহনবাগানের এই বিপুল খ্যাতি কিন্তু শুধু ফুটবলারদের জন্যই হয় নি। ক্লাবের গৌরবময় ইতিহাসে দক্ষ কর্মকর্তাদের অবদানও কিছু কম নয়। এই কর্মকর্তারা শুধু তরুণ প্রতিভাকেই খুঁজে বার করেন নি, ক্লাবের ঐতিহ্যকেও প্রাণপণে রক্ষা করে গেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কতো ক্লাব এসেছে এবং চলে গেছে, চিরকালের জন্য যেগুলি থেকে গেছে তার মধ্যে একটির নাম মোহনবাগান। ১৯১৩ সালে যখন ক্লাবে যোগ দিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এই ক্লাব একদিন এমন বিরাট সংগঠনে পরিণত হবে।

মোহনবাগান শুধু কয়েকজন সদস্য বা শুধু বাঙালীর নয়, সমগ্র ভারতবাসীর গর্বের বিষয়। সেইজন্যই, একাধিক ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তি এই ক্লাবকে 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলে অভিহিত করেছেন।

এবং আমি তাই ভাগ্যবান, এই মহান ক্লাবের জার্সি গায়ে দিতে

পেরেছিলাম। আমার সৌভাগ্য—শিবদাস ভাদুড়ী, বিজয়দাস ভাদুড়ী, অভিলাষ ঘোষ, ভূতি সুকুল, মণি দাস, হেমাঙ্গ বসু, উমাপতি কুমার, বলাই চ্যাটার্জী, রবি গাঙ্গুলী ও সামাদের মতো সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম।

একটা কথা আমি খোলা গলায় বলতে পারি, শিবদাস ও বিজয়দাস ভাদুড়ী, উমাপতি কুমার এবং সামাদের মতো ফুটবলার পৃথিবীতে কম জন্মেছেন। হয়তো আজকের তরুণেরা তা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমার মনে কোনো রকম সন্দেহ নেই।

জীবনে কী পাই নি তার হিসেব মেলাতে আমি কখনও বসি না। কারণ মোহমবাগানে খেলে আমি যে সম্মান এবং আনন্দ লাভ করেছি আমার জীবনে তার চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নয়।"

মোহনবাগান অবশ্য শেষ দিকে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল। তারা আবার হৃদয়ের আন্তরিকতা নিয়েই গ্রহণ করেছিল তাদের প্রাণপ্রিয় দেবতুল্য বরেণ্য ফুটবলারটিকে। ক্লাবের ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে ক্লাবের তরফ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে এই অভিনন্দনই কি প্রমাণ করে না এই মহান ফুটবলারটির প্রতি ক্লাব কর্মকর্তাদের সহৃদয় আন্তরিকতা? এই অভিনন্দনটুকু ছাড়া তাঁর কি মোহনবাগান ক্লাবের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়ার ছিল না?

এই প্রশ্নের জবাবী ভাষণ দিতে গেলে আমাকে উল্লেখ করতে হবে প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক আরবি'র একটি রচনা। 'তাঁকে যেমন দেখছি' এই নিবন্ধে আরবি তাঁর রচনার এক জায়গায় লিখেছেন—"১৯৫৬ সালে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত গোষ্ঠ পাল সম্বর্ধনা সমিতি ১৫ই আগস্ট-এর কংগ্রেসী উৎসব মঞ্চে গোষ্ঠবাবুকে যে সম্বর্ধনা জানায় তাতে ওই সমিতির তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা উপহার দেওয়া হয় তাঁকে। ওই অনুষ্ঠানে তদানীন্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর তরফ থেকে গোষ্ঠবাবুকে দশ হাজার (১০,০০০)

টাকা দানের প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। সেই টাকা গোষ্ঠবাবু পান হরেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৬০ সালে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু রাজ্যপাল থাকা কালে এবং রাজ্যপালের তদানীন্তন সহকারী সচিব ফুটবল রসিক ও মোহনবাগান সদস্য শ্রীযুক্ত সৌরেন সেনের বিশেষ প্রয়াসের ফলে।

কিন্তু দুঃখের কথা ওই একই সঙ্গে মোহনবাগানের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক তথা অই. এফ. এ. প্রেসিডেণ্ট এস. এম. বসুর প্রতিশ্রুত মোহনবাগান ক্লাবের সম্মানার্ঘ্য বিশ হাজার (২০,০০০) টাকার তোড়া গোষ্ঠবাবুর কাছে কোনো দিনই পৌঁছয় নি। ওই তোড়া সংগ্রহে ক্লাব সদস্যদের কাছে চাঁদা দেবার জন্য যে মুদ্রিত আবেদন করেছিলেন তার একখানা গোষ্ঠবাবুর ঠিকানায়ও প্রেরিত হয়েছিল।

গোষ্ঠবাবুর প্রতি মোহনবাগান ক্লাব যে ব্যবহারই করে থাকুক না কেন, ভারতীয় ফুটবলের কাছে তিনি ছিলেন পরাধীন যুগে মোহনবাগান ক্লাবের প্রাণশক্তি। মোহনবাগান ক্লাবের চরমতম ব্যর্থতার দিনে তিনি ছিলেন দলের কাছে একমাত্র সম্পদ—জাতির মহাশক্তি।

এহেন মানুষটি কার কাছে কি পেলেন তার হিসাব কোনোদিনই করেন নি। তাঁর পরিচিত কারো মুখ থেকে কখনও বলতে শোনা যায় নি, গোষ্ঠবাবু বলেছেন আমি অনেক দিয়েও কিছুই পাই নি। বরং তিনি কলকাতা ময়দানের একজন বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি হয়েও বারবার বলেছেন—"ক্লাব আমায় অনেক দিয়েছে, দেশের মানুষ আমাকে সম্মান করেছে—এর বেশী আর আমার কিছু পাওয়ার নেই।"

কার কাছে কার কতোটুকু কি পাওনা তার হিসাব-নিকাশ কি এতো সহজে মিলে যায়? আসলে সমকালে যার হিসাব মেলে না তার সঠিক মুল্যবোধ বোঝা যায় উত্তরকালে। নিজের কালকে, নিজের সময়কে যিনি বিপুল কঠিন পরিশ্রমে অতিক্রম করে, উত্তরকালে পৌঁছেও যিনি নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারেন—সেই তো হতে পারেন কালজয়ী পুরুষ। গোষ্ঠবাবু ফুটবলের মূল্যায়ণে সেই

কালজয়ী পুরুষদের একজন, যাঁর ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা, স্বদেশ চেতনা, জাতীয়তাবোধ এবং খেলোয়াড়োচিত মনোভাব, সমগ্র দেশবাসীকে স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে তিনি জয় করেছিলেন সমগ্র ভারতবাসীর অন্তর। তাঁর নীতি, আদর্শ, দর্শন, চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি পরাধীন ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল সত্যিকারের ভারতীয়ানা। উনিশ শতকের ধারা বেয়ে বিশ-তিরিশ দশক পর্যন্ত এই মানুষটি সমগ্র বাঙালী জাতির জীবন চেতনাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ছিলেন। স্বাধীনতা ঈপ্সিত একটি জাতির সমগ্র যুবশক্তিকে তিনি ফুটবলের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে ময়দানের লড়াইতে ঐক্যবদ্ধ হতে শিখিয়েছিলেন, যা আর অন্য কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে তাঁকেই পরাধীন যুগের মানুষ বসিয়েছিলেন নেতার আসনে। তাঁর সেদিনের সেই ভাবমূর্তি আজ স্বাধীনতাত্তোর চল্লিশ বছরের মধ্যেও অন্য কারো পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি—তাই জাতীয় চেতনার নবতম মূল্যায়ণে গোষ্ঠবাবু প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সমগ্র বাঙালী জাতির জীবন দেবতা হিসাবে।

সেই কারণে বর্তমান বাংলার জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার ক্রীড়া-জগতের সার্বিক উন্নতি প্রকল্পে যে বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তার সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই এই একমেবদ্বিতীয়ম্ সংগ্রামী, স্বদেশ প্রেমিক, আদর্শবান, হৃদয়বান, চরিত্রবান ও সাহসী মানুষটিকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন জাতীয় খেলোয়াড়ের প্রতীক হিসাবে, বসিয়েছেন ক্রীড়া জগতের নবতম মূল্যায়ণে একজন গণজাগরণের নেতার আসনে। তাঁর জন্মদিনটিকে বেছে নিয়ে সারা বাংলায় বর্তমান বছরে (১৯৮৬) পালিত হয়েছে সরকারী উদ্যোগে—'ফুটবল দিবস'। প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকারের এই প্রচেষ্টাকে এবং তাঁদের এই নবতম ক্রীড়া আন্দোলনের কর্মসূচীকে জানাই আমার আন্তরিক সমর্থন। যদি বাংলার ক্রীড়াঙ্গনের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করতে হয়, যদি সমস্ত প্রতিকুল বাধা ডিঙিয়ে বাঙালীকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়, যদি গোটা জাতিকে

ঐক্যবদ্ধ আদর্শের পথে চালিত করতে হয় তাহলে ফুটবলের মহানায়ক গোষ্ঠ পালের মহাআদর্শই হবে বর্তমান যুবশক্তির কাছে জাতীয় প্রেরণা। মনে হয় বাঙলার ক্রীড়াঙ্গনের অবক্ষয়ের কথা স্মরণ রেখেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গোষ্ঠবাবুর ভাবমূর্তিটি আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে এমন একটি সার্থক সরকারী দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

গোষ্ঠবাবু শুধু মাত্র একজন ফুটবলার ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাঙালী ক্রীড়াবিদ্। ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়মিত ক্রিকেট ও হকি খেলেছেন মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে। ক্রিকেট ব্যাট হাতে গোষ্ঠবাবু ফুটবলার গোষ্ঠবাবুর মতোই ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের কাছে আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যাসাগর কলেজের হয়ে খেলে তিনি প্রথম ক্রিকেট মাঠে স্বীকৃতি পান, পরে তিনি হন মোহনবাগান ক্লাবের একজন নিয়মিত ক্রিকেটার। শুধু ফুটবল-ক্রিকেট নয়, টেনিস ও হকি এই দুটি বিভাগেও গোষ্ঠবাবু ছিলেন সমাম দক্ষ। টেনিস আসরে তাঁর হাতে বহুবার বহু শ্বেতাঙ্গ টেনিস খেলোয়াড় হার স্বীকার করেছেন। মোহনবাগান টেনিস টিমে তিনি ছিলেন একজন প্রয়োজনীয় সৈনিক। আর হকি? কলকাতা ময়দানে বিশ-তিরিশ দশকে তাঁকে মোহনবাগানের হয়ে বহুবার হকি ম্যাচে অংশ নিতে দেখা গেছে। তাঁর হকি খেলার প্রশংসা করেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়েরা। হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ ছিলেন গোষ্ঠবাবুর একজন গুণগ্রাহী। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণায়, গোষ্ঠবাবু যদি ফুটবলের জন্য অধিক সময় ব্যয় না করে, কেবল হকি খেলাতে মনোনিবেশ করতেন, তাহলে ভারতীয় দলের হয়ে তাঁর পক্ষে আন্তর্জাতিক আসরে অংশ নেওয়া মোটেই অসম্ভব হতো না।

আসলে বিশ-তিরিশ দশক জুড়ে ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে যে নব-জাগরণের প্লাবন এসেছিল, সেই নবজাগরণের নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে অভিজ্ঞ বাঙলার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্ গোষ্ঠ পালকে। তাঁর ব্যক্তিত্বের

কাছে নতি স্বীকার করেই শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠি তাঁর নামের আগে সর্বদাই 'গ্রেট' শব্দটি ব্যবহার করে এসেছে। স্বীকৃতি দিয়েছে সেরা ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে—"চাইনিজ ওয়াল" নামকরণের মধ্যে দিয়ে।

গোষ্ঠ পাল আমাদের প্রতিটি বাঙালীর কাছে গর্ব। পরাধীন যুগে তাঁর সম্মান ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, সূর্য সেন প্রমুখ বীর বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তুলনায় খাটো ছিল না। তাঁর সম্মান ছিল বাঙালীর জাতীয় চেতনায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের সমতুল্য। নয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বহু শহীদ বীর বাঙালী সন্তানদের নাম অস্বীকার করে গেছে। তাঁদের লিখিত সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপযুক্ত মূল্যায়ণ হয় নি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের—বাঙলা ও বাঙালীর আবেদনকে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই আড়াল করে গেছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনো অবস্থার মধ্যেই সম্ভব হয় নি বাঙলা ও বাঙালীকে অস্বীকার করে যাওয়া। সেই কারণেই ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন বাংলার বরেণ্য ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তিনি প্রথম ফুটবলার, যাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হলো। সেদিনের এই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, তাঁকে একজন সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন—"গোষ্ঠ পাল একজন ফুটবল খেলোয়াড় হলেও, তাঁর সংগ্রামী চেতনা সমগ্র ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল।" গোষ্ঠবাবুর এই স্বীকৃতি—বাংলার স্বীকৃতি, বাংলার গর্ব, বাংলার ফুটবলের মর্যাদা।

রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত এই মানুষটি তাঁর জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেদিন বলেছিলেন—"আমরা ফুটবল খেলেছি বাঁচার তাগিদে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে সেদিন আমাদের কাছে ফুটবল

ছিল একমাত্র হাতিয়ার। ওরা (ইংরেজ) আমাদের পদে পদে অপমান করতো, মাথা নীচু করে চলতে বাধ্য করতো, মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলেই প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই মাথা নুয়ে দেবার চেষ্টা করতো। সেই আত্মগ্লানিতে কুঁকড়ে থাকা জীবনের কাছে ফুটবল ছিল আমাদের কাছে আত্মমর্যাদায় রুখে দাঁড়াবার ক্ষেত্র, একমাত্র প্রকৃত লড়াইয়ের ভূমি। ফুটবল মাঠে ওদের আমরা ভয় করতাম না, সমস্ত অত্যাচার ও অপমানের বদলা নিতাম। মাঠের লড়াইতে ওরা আমাদের ভয় করতো। হাজার হাজার পরাধীন দেশবাসীকে জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে যখন আমরা ওদের সকলের সামনে নাকাল করতাম, তখন যে কি আনন্দ হতো, তা আমি এই মুহূর্তে বোঝাতে পারবো না। বলে বোঝাতে পারবো না তা ছিল আমাদের কাছে কতো বড় আত্মতৃপ্তি—আত্মপ্রসাদ। তাই ফুটবল ছিল আমার প্রাণ, আমার রক্ত, আমার শক্তি, সাহস, আদর্শ ও দর্শন। পরাধীন যুগে এই ফুটবলই ছিল আমাদের কাছে স্বাধীনতা ও অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার।”

সংগ্রামী মানুষটির এই বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সংগ্রাম সতেজ চরিত্রটি। ফুটবল যে শুধু খেলা নয়, এই খেলার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে যে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন গোষ্ঠবাবু—তাঁর সেই শিক্ষাই আজ বাংলার ময়দানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রয়োজন জাতীয় স্তরে বিচ্ছিন্ন যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁর আদর্শ ও বাণীকে বাঙলার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া। বাঙলার ক্রীড়া মর্যাদা ও গরিমাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁদের এই পরিকল্পনা সার্থক হয়, যদি গোষ্ঠবাবুর আদর্শ ও জাতীয়তাবোধে বাঙলার যুবশক্তি উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তাহলে বাঙলা ও বাঙালী আবার যে ক্রীড়াঙ্গনে হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরজন্য শুধু সরকারী উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হলো ময়দান-প্রিয় প্রতিটি মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা এবং

তাঁদের আত্মিক চাহিদা।

এতো কথার পরেও যেন কিছু কথা থেকে যায়। সব কথা বলা হলেও যেন মনে হয় তবু কিছু বলা বাকি রয়ে গেছে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্ হিসাবে গোষ্ঠ পাল সম্পর্কে সেই কথাই বলার। গোষ্ঠবাবু শুধুমাত্র বাঙলার ময়দানে একজন সেরা ফুটবলার এবং কৃতি ক্রিকেটার, টেনিশ ও হকি খেলোয়াড় ছিলেন না, তিনি ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক। যে ক্লাবের হয়ে তিনি পঁচিশ বছর বাঙলার ময়দান দাপিয়ে বেড়িয়ে ছিলেন, ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির মনে, সেই ক্লাবের তিনি একজন সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ না করলেও তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন ক্যালকাটা রেফারিজ এসোসিয়েশনের সঙ্গে। তিনি ক্যালকাটা রেফারিজ এসোসিয়েশনের শুধু প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক এবং পরবর্তী কালের অন্যতম সভাপতি। এছাড়া তিনি কলকাতা মাঠে একজন ভাল রেফারি ও ক্রিকেট আম্পায়ার হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজেই সবদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর কর্মময় জীবনটিকে আমরা বাঙলার ক্রীড়াজগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হতে দেখি। তাঁর মতো এমন নিঃস্বার্থ ভাবে বাংলার ক্রীড়াজগতকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে দ্বিতীয় আর কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায় নি।

পরিশেষে আর একটি খবর পাঠকদের জানাই, সেটি হলো বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন গোষ্ঠবাবু। ১৯৩২ সালের ১৬শে অক্টোবর ছবিঘরে ন্যাশনাল পিকচার্সের একটি ছবি মুক্তি লাভ করেছিল। ছবিটির নাম 'গৌরীশঙ্কর'। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন আনন্দমোহন রায়। এই নির্বাক ছায়াচিত্রে গোষ্ঠবাবু জনৈক বিজ্ঞানীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ছবিটির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কেষ্টধন মুখার্জী, ননীবালা দেবী, ডলি দত্ত, রেনুকা দেবী প্রভৃতি বিখ্যাত নট-নটীরা।

এই অনন্য সাধারণ মানুষটির কর্মময় জীবনের ছেদ পড়েছিল ১৯৭৬ সালে। সেই প্রথম সংগ্রামী, সাহসী, বিপ্লবী, স্বদেশপ্রেমিক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্বটি মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। মাথা নত করলেন মহাকালের মহিমাময় মৃত্যুর কাছে—যে মৃত্যু সময় সময় একেকটি জীবনকে অমৃত স্পর্শে অমরত্ব দান করে যায়। গোষ্ঠবাবুর জীবনের সত্যতা প্রমাণ করে যে, এই মৃত্যুর স্পর্শই তাঁকে কালজয়ী করে তুলেছে। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

মৃত্যুর দশ বছর বাদে বাংলা ক্রীড়া অঙ্গন জুড়ে গোষ্ঠবাবুর নাম উচ্চারিত হওয়া দেখে অন্ততঃ সেই কথাই আমার নতুন করে মনে হলো। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক অজয় বসুর একটি রচনার কয়েকটি লাইন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন—

"আত্মবিস্মৃত জাতি বলে বাঙালীর দুর্নাম আছে। তবে বাঙালী ফুটবল মাঠে অবিসংবাদিত নায়ক গোষ্ঠ পালকে ভুলতে পারে নি। হয় তো ভবিষ্যতেও ভুলবে না। তাঁর তিরোধানের দশ বছর পর স্মরণোৎসবের আয়োজন দেখে সেই বিশ্বাসই দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বাস সত্য হোক। আত্মবিস্মৃতির দায় বাঙালীর ঘাড় থেকে এমনি করেই খসে পড়ুক।"

১৯৮৬ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখটিকে বাঙলার মানুষ সশ্রদ্ধায় পালন করেছেন। ঐদিন ময়দানে মহানায়ক গোষ্ঠ পালের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনটি ছিল সরকারী উদ্যোগে সারা বাঙলা ফুটবল দিবস। এই সভাতেই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় সরকারের এক নয়া পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এই বছরের শেষেই সারা রাজ্যে পঁচিশটি স্পোর্টস স্কুল চালু করা হবে। এই স্কুল-

গুলিতে রাজ্যের তরুণ খেলোয়াড়েরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা নিতে পারে তার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এই অনুষ্ঠানে গোষ্ঠ পালের মর্মর মূর্তিতে একে একে মাল্য দান করেন বাঙলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। প্রথম মালাটি গোষ্ঠ পালের মর্মর মূর্তিতে পরিয়ে দেন কলকাতার মেয়র কমল বসু। এরপর একে একে মাল্যদান করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী-সহ গোষ্ঠ পালের ক্রীড়া জীবনের সঙ্গী বর্ষীয়ান খেলোয়াড় উমাপতি কুমার, পরিতোষ চক্রবর্তী, চুনী গোস্বামী প্রমুখ খেলোয়াড়গণ সহ শ্রদ্ধেয় গোষ্ঠ পালের সহধর্মিনী শ্রীমতী পুষ্প পাল। এইদিন সন্ধ্যায় নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে গোষ্ঠ পালের স্মরণ সভায় সংবর্ধনা জানানো হয় বাংলার প্রখ্যাত বর্ষীয়ান ফুটবলার ও কোচ শ্রীযুক্ত তেজেশ (বাঘা) সোম মহাশয়কে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দেন শ্রীযুক্ত সোমের হাতে। এই অনুষ্ঠানে তিনি গোষ্ঠ পালের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে গর্বিত চিত্তে বলেন—

"এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই হয়তো সুযোগ হয় নি গোষ্ঠ পালের খেলা দেখার। আমি সেই সুযোগে গর্বিত। আমি গোষ্ঠ পালের খেলা দেখেছি। তিনি আমাদের সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গোরাদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে ওঁর লড়াই দেখে আমরা সেদিন সবাই অনুপ্রাণিত হতাম।"

বলা বাহুল্য, এই দিনই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেছেন, এই বছরের শেষ দিকে রাজ্যের স্কুল ছাত্রদের নিয়ে গোষ্ঠ পাল মেমোরিয়াল কাপের খেলা শুরু হবে। সরকারী এই ঘোষণায় বাঙালী মাত্রই আমরা আনন্দিত।

পরিশেষে বলি গোষ্ঠ পালের নামে ক্রীড়া আন্দোলন ও ফুটবল দিবস পালনের মধ্যেই যেন আমাদের কর্তব্য শেষ না হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, পরাধীন যুগে যে মানুষটি আমাদের সাহসের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির বিরুদ্ধে পাঞ্জা লড়তে শিখিয়ে ছিলেন, খেলার মাঠে যাঁর দৃঢ়তা, সাহস, আপোষহীন সংগ্রাম, প্রখর নীতিবোধ, অপরাজেয় মানসিকতা

দেশের সমগ্র যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল জাতীয় মন্ত্রে —সেই মানুষটির প্রতি স্বাধীনোত্তর প্রতিটি বাঙালীর নিজস্ব কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য হলো তাঁর আদর্শের ভাবমূর্তিটি রক্তের গভীরে জাগ্রত করা—যা পারে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ক্রীড়াঙ্গনে সমগ্র জাতিকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করে সমগ্র যুবগোষ্ঠিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে। বাংলার ক্রীড়াভূমির অবক্ষয়ের দিনে তাই তাঁর নামমন্ত্র উচ্চারণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী—এই উপলব্ধি হবে বাঙলার বাঙালীর সচেতনতায় গোষ্ঠ পালের যথার্থ মূল্যায়ণ। মনে রাখতে হবে মহাকালের মহানায়ক গোষ্ঠ পাল আজও ফুটবল মাঠে আছেন, তিনি পঞ্চভূতে বিলীন হয়েও বিরাজ করছেন বাঙালীর অন্তরে অন্তরে, রক্তে রক্তে। কবির ভাষায়—

"নয়ন সমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়াছ যে ঠাঁই।"